কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

মার্চ ৮৪

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

নবম

কলিকাতা পুস্তকমেলায়

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের

স্টলে

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার

নতুন, পুরাণো ও বিশেষ সংখ্যা

পাওয়া যাচ্ছে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

3য় বর্ষ 11শ সংখ্যা
মার্চ 1984
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহঃ সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

2 মার্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তোমাদের সবার পরীক্ষা ভাল হোক কামনা করি। যাদের ঠিক এই মুহূর্তে পরীক্ষা নেই তারা একবার বই মেলায় ঘুরে আসতে পারো। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে এবারও মেলায় ষ্টল নেওয়া হয়েছে। পত্রিকার নতুন ও পুরোন সব সংখ্যা সেখানে দেখতে ও কিনতে পারবে। এছাড়া বিজ্ঞানের সব মজার মজার বইও পাবে।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2

দপ্তর থেকে
বরফ যুগ আসছে ॥ সমরজিৎ কর 5

পড়াশোনা
পদার্থবিদ্যা ॥ অলক চক্রবর্তী 15
শৃঙ্গ কোণ ॥ নন্দলাল মাইতি 29
অন্যোন্যক সংখ্যার মজা ॥ সজল চক্রবর্তী 11
স্পিরিট ॥ অমরনাথ রায় 33

ছবিতে গল্প
প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 17
জুলে ভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগ্‌স আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার 18, 19, 20
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 37
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 38, 39
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ॥ ধীরেন বল 40
মজার ছবি ॥ প্রণব হোড় 28
মৎস শিকার ॥ উজ্জ্বল ধর 34

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
মসকালিনাইট ॥ সম্কর্ষণ রায় 25

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
আর্কিমিডিস ॥ চৈতালী ঘোষ 12
ভূ-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ॥ সুনীত রায় 23

পশু পাখি উদ্ভিদ
মজার পাখি আলবাট্রস ॥ পরেশ দত্ত 22
পরিচিত গাছ ধুতরো ॥ নির্মাল্য চক্রবর্তী 31
রঙবেরঙের বাঘ ॥ বিশ্বনাথ বসু 35

উপন্যাস
সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 41

শরীর স্বাস্থ্য চিকিৎসা
দাঁত ॥ সুভাষ সান্যাল 14
মনের অসুখ ॥ সুজিত মুখোপাধ্যায় 34

ছড়া
পিশেমশায় ॥ আশা দেবী 45

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
বসন্তের আকাশ ॥ বিমান বসু 9
অভিনব ফোয়ারা ॥ চন্দনকুমার নাগ 13
সূর্যের সৃষ্টি ও মৃত্যুর দিন ॥ শচীনাথ মিত্র 21
ধাতুর দৌড়ে প্রথম 87 নম্বর মৌল ॥ কমল চক্রবর্তী 24
ভারী পদার্থের ওজন ॥ কানাইলাল চক্রবর্তী 32
মহাকাশ গবেষণা ॥ জগদীশ চৌধুরী 46
বইমেলা ত্রিপুরায় ॥ হানুনান আহসান 47
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ ॥ বরুণ মজুমদার 8
বিজ্ঞান সংবাদ 7

ছোটদের দপ্তর
নলেজ কুইজের উত্তরদাতাদের নাম 49
নলেজ কুইজ : গত সংখ্যার সমাধান 50
গত সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান 50
সংখ্যাকূট ॥ জয়জিৎ লাহিড়ী 50
প্রশ্নোত্তর ॥ অজয় চক্রবর্তী 51
জেনে রাখ ॥ তিমির বরণ বিশ্বাস 51
গাছেরাও কি চিন্তা করে ॥ তাপসকান্তি হালদার 52
নিজে নিজে কর ॥ দেবাশিষ পাল 53
ভেবে ভেবে বল ॥ চন্দন রুদ্র 54
রেডিয়াম-ঘড়ির অপকারিতা ॥ সত্যজিৎ সেন 54
যন্ত্রমানব ॥ অমিতকুমার দে 55

ছবি এঁকেছেন : অলয় ঘোষাল।

Satyajit Ray

৫৭ হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০২৬
ফোন : ৪৭-১০১২

১১. ১. ৮৪

শ্রী রথীন বল
পরম প্রীতি-ভাজনেষু

রথীন,

তোমাদের 'ফেলু-দা ক্লাব' বেশ জমে উঠেছে লিখেছ। এ খবরে [illegible] [illegible], [illegible] এমন উঁচু স্থান আমি ভাবিনি, উচিত চাই-ও না। অনেকদিন আমার পাঠকেরা যে ভালবাসে তা আমার অজানা নয়। কিন্তু তোমাদের ফেলু-দা-ক্লাব মারফত যে ভালবাসার যে সব আশ্চর্য ও মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত প্রমাণ পাচ্ছি তাতে অভিভূত হইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। বেঁচে থাকতেই 'ফেলু-দা ক্লাব' দেখে গেলাম এটা বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।

'ফেলু-দা ক্লাবের' বিষয় মত থেকে সাতাশী-পার্টি করেছে কইজনের! 'ডসাহেবের' কথা লিখে তুমি এ ক্লাবের সভ্য হবার নিয়ম টিয়ম সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে কিনা জানতে চেয়েছ। আমার বলার-ও শুধু এই আছে যে ফেলু-দাকে যারা ভালবাসে, ক্লাবটা যখন তাদের, তখন সভ্য হতে যারা চায় তাদের জন্যে ফেলু-দা সম্বন্ধেই কে কতখানি জানে তা বোঝবার জন্য দশটা প্রশ্ন রাখলে কেমন হয়? দশটার প্রশ্নের মধ্যে আটটার সঠিক উত্তর দেবে সে বিশেষ সভ্য বলে গণ্য হবে। সাধারণ সভ্য হবার জন্যে তিনটে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারাই যথেষ্ট। আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখো। আন্তরিক প্রীতি নিও।

শুভেচ্ছা-
সত্যজিৎ

ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলী

ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলী জানতে চেয়ে আমাদের দপ্তরে প্রচুর চিঠি এসেছে। আমরা এ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম, ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছেই। তিনি এ সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর সেই চিঠি আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। এ সংখ্যাতেও তাঁর হাতে লেখা মূল চিঠিটাই প্রকাশ করা হল। তিনি জানিয়েছেন, ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে গেলে কোন চাঁদা লাগবে না। তবে ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের একটি সর্ত মানতে হবে। তা হল—নিম্নলিখিত ঘনাদাবিষয়ক দশটি প্রশ্নের মধ্যে যাঁরা অন্ততঃ তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন, তারা সাধারণ সদস্য, যারা সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন তারা বিশেষ সদস্য এবং যারা দশটির মধ্যে দশটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবেন, তারাই কার্যকরী সমিতির সদস্য হবেন। —সম্পাদক

১। ঘনাদার প্রথম গল্পের নাম কি ?

২। নকল ইবন করিদের সঙ্গে ঘনাদার কোথায় আলাপ হয়েছিল ?

৩। ঘনাদার দাদার নেশা কি ছিল ?

৪। বাপী দত্তর খালি সীটে মেসে নতুন বোর্ডার হিসেবে কাকে নেওয়া হয়েছিল ?

৫। দ্বিতীয়বারের মহাকাশ যাত্রায় ঘনাদার সঙ্গী ছিলেন কে কে ?

৬। 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' কি জিনিস ?

৭। ই. ইউ. ডব্লিউ. সি. এবং এম্. বি. ডি. ও. ই. কথা দুটির সম্পূর্ণ অর্থ কি ?

৮। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটেছে অথচ মহাভারতে নেই —এমন কোন ঘটনা ঘনাদা কৌরবদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ?

৯। 'পার্দা চিরস মার্মোরেটাস' কিসের নাম ?

১০। 'কয়া' কে ?

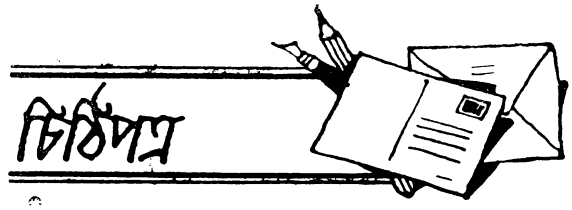

"বাহ্যিক বল প্রয়োগে সৃষ্ট দোলন উদ্ভিদের ফলের বৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখে"

আমাদের বাড়ীর উঠোনে একটা বড় লাউ গাছ হয়েছিল। শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে বেশ লম্বা হয়েছিল। ঐ গাছের গোড়ায় আমি কিছু urea (ইউরিয়া) সার দিয়েছিলাম। মা রোজ ঐ গাছের গোড়ায় জল দিতেন। ফলে গাছটি বেশ তেজী হয়েছিল। সে সময়টা ছিল বর্ষাকাল। গাছে প্রচুর লাউ ফুল ফুটেছে। দশ বারোটির মত বিভিন্ন সাইজের লাউ ধরেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টির ওজন প্রায় ৪০০ গ্রামের মত। অন্যগুলোর ওজন তার থেকে আরো কম। যেমন 200 gm, 100 gm, 50 gm ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনটি লাউয়ের পিছনে তখনো পর্য্যন্ত ফুল লেগে রয়েছে। একদিন রবিবার সকালে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ছোট বড় মোট ছয়টি লাউয়ের বৃদ্ধি হচ্ছে না। দেখে দেখে বোঝা যাবে যে এগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। অন্য গুলোর যথারীতি বৃদ্ধি হচ্ছে এবং আয়তনে বড়ো হচ্ছে।

এক সপ্তাহ পরে রবিবারে বিকাল বেলায় আমার ছোট ভাগনীকে কোলে করে নিয়ে লাউ গুলোকে দেখতে লাগলাম। যে ছয়টি লাউয়ের বৃদ্ধি হচ্ছে না সেগুলোকে হাত দিয়ে নাড়াতে লাগলাম। ফলে লাউ গুলো দোল খেতে লাগল। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে আঘাত করলাম যাতে লাউগুলো অনেকক্ষণ ধরে দোল খেতে থাকে। এইভাবে ঐ ছয়টি লাউয়ের প্রত্যেকটি প্রায় ৫-১০ মিনিট ধরে আন্দোলিত হয়েছিল আমার হাতের আঘাতে। অন্য যে লাউগুলোর বৃদ্ধি হচ্ছিল সেগুলোকে কিন্তু আঘাত করি নি। যে লাউ গুলোর বৃদ্ধি হচ্ছিল না সে গুলোকে আঘাত করে দুলিয়ে ছিলাম খেলার ছলে ভাগনীকে দেখবার জন্য। কেননা ঐ লাউ গুলোর বৃদ্ধি হচ্ছে না। ঐ গুলো তো নষ্ট হয়ে যাবে।

এক সপ্তাহ পরে রবিবার সকালে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ঐ ছয়টি লাউ-এর প্রত্যেকটির আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধি আবার শুরু হয়েছে। ওজনও বেশ বেড়েছে। আমি তো অবাক। কিন্তু বুঝতেই পারছিনা ব্যাপার কি। লাউ গুলোর বৃদ্ধি হচ্ছিল না, সুতরাং নষ্ট হয়ে মরে যেত। কিন্তু আমার হাতের আঘাতে দোলা খাওয়ার দরুণ ওদের ব্যাহত বৃদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। নতুন করে আবার বাড়তে শুরু করল। তারপর আরো এক সপ্তাহ পরে দেখলাম ঐ লাউ গুলোর ওজন বেড়ে গিয়ে প্রায় 2-3 কিলোগ্রামের মত হয়েছে। ইতিমধ্যে আরো অনেক ছোট ছোট লাউ ধরেছে। আমি সেই সব লাউগুলোকে আমার হাতের আঘাত দিয়ে দোলা দিয়েছিলাম। এক সপ্তাহ পরে দেখলাম ঐ সব লাউ গুলোর বেশ বৃদ্ধি হচ্ছে। আগের ছয়টি লাউয়ের মধ্যে 2টি লাউ খাওয়া হয়ে গেছে। বাকি চারটির ওজন প্রায় 4-5 কেজির মত। ইতিমধ্যে অফিসের কাজের জন্য বাড়ীর বাইরে ছিলাম। আমার এই কথা মনে ছিল না। হঠাৎ বাড়িতে চলে এলাম এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে পূর্বের ঐ চারটি লাউয়ের যদি একটি থাকে তাহলে তা উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানীদের কাছে পরীক্ষা করার জন্য পাঠাব। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে দেখলাম মা ঐ ছয়টি লাউয়ের সব কটি কেটে ফেলেছেন ও খাওয়া হয়ে গেছে।

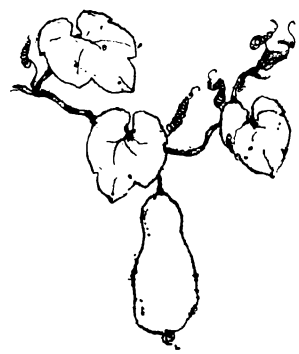

এর পর থেকে আমি আরো অনেক লাউয়ের উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। প্রত্যেকটার কুঁড়ি অবস্থার পর এক সপ্তাহ পরে হাত দিয়ে নাড়িয়ে দুলিয়ে দিয়েছি। যাতে সেগুলি অন্ততঃ 5 থেকে 10 মিনিট পর্য্যন্ত দোলা খায়। দেখেছি প্রত্যেকটি লাউয়ের বৃদ্ধি হয়েছে। কোনটি মরেনি। আমার মতে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে লাউ গুলোর বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা যায়, এই পদ্ধতি পৃথিবীর সব দেশে বিভিন্ন ধরণের ফলের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর তথা বিভিন্ন দেশের কৃষিজ উৎপাদন ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। কেননা উদ্ভিদের বেশীর ভাগ কুঁড়ির এই ছোট অবস্থায় বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং পরে মারা যায়। তাই বিভিন্ন দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করছি এ ব্যাপারে গবেষণা করতে এবং এটা পৃথিবীর সব দেশে প্রযোজ্য কিনা পরখ করে দেখতে।

রমেন কুমার পাণ্ডুই
17, চেতলা রোড, কলি—27

বরফ যুগ আসছে

সমরজিৎ কর

বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েক বছর ধরে বলে আসছেন পৃথিবীর আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটছে। গত বছর জুলাই মাসে যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম তখন তো নিজেই অনুভব করে এলাম। শুনেছি, এক সময় লণ্ডন শহরে জুলাই মাসে নাকি গরম পোশাক পরতে হত। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ঠিক উল্টো। লণ্ডনে এত গরম, হাল্কা হাফ শার্ট পরেও আমি ঘেমেছি। একজন আবহাওয়া বিজ্ঞানী বললেন, জুলাই অগাস্ট মাসে ইংলণ্ডে নাকি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতই গরম। অথচ আগে এমনটি ছিল না।

তোমরা যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়, নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, গত কয়েক বছর আমাদের দেশে কেমন আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। গত বছরেই ধর না, দেশের বিরাট অঞ্চল জুড়ে কি প্রচণ্ড খরা গেল। এক দিকে অনাবৃষ্টি। আবার কোন অঞ্চলে প্রচণ্ড ঝড়। কাশ্মীর উপত্যকায় দীর্ঘ দিন ধরে তুষার ঝড়ও কি কম গেল? আমাদের বাড়ির কাছে দার্জিলিংও তা থেকে রেহাই পায় নি! একটি খবরে দেখছিলাম, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা নাকি আগের তুলনায় খানিকটা কমেছে। এই কমের দিকটা বেশি করে নজরে পড়ছে উত্তর আতলন্টিক এলাকায় এবং গ্রীনল্যাণ্ডে। দক্ষিণ গোলার্ধে প্রতি বছর বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ছে। ওদিকে উত্তর গোলার্ধে যে সব অঞ্চল সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে, অথবা যে সব অঞ্চলে বরফ পড়ে বেশি, সেখানে আরো বেশি বরফ পড়ছে। মেরু অঞ্চলে হিমবাহের পরিমাণ বাড়ছে। সেই হিমবাহ এগিয়ে আসছে উষ্ণ অঞ্চলের দিকে। এ সব দেখে শুনে তাই বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, পৃথিবীর বুকে আবার হয়ত নেমে আসছে বরফ যুগ। যে সব অঞ্চলে বরফ জমে না সেই সব অঞ্চল আবার হয়ত ঢেকে যাবে বরফের পুরু আস্তরণের নিচে। শীত। প্রচণ্ড শীতে তখন সেখানে প্রাণ রাখাই হবে দায়। গাছপালা যাবে মরে। পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হবে হয়ত অনেক প্রাণী।

হয়ত প্রশ্ন করবে, আবার যে বরফ যুগ আসছে, তা কি করে বুঝতে পেলেন বিজ্ঞানীরা?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ভূতাত্ত্বিকরা। পৃথিবীর বুকে যে বার বার বরফ যুগ এসেছে তার প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন ভূত্বকের মধ্যে। এই ধর না, আমাদের আসাম, শিলং প্রভৃতি অঞ্চল এক সময় বরফের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। সাহারা এখন বালির মহাসাগর। অথচ সেই সাহারাও এক সময় ঢাকা পড়ে পুরু বরফের আস্তরণে। হাজার হাজার বছর আগে। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা তখন বরফ রাজ্য। ভূতাত্ত্বিকরা ভূস্তর পরীক্ষা করে অনুমান করেছেন, বরফ যুগ আসার আগ মুখে পৃথিবীর আবহাওয়ায় দেখা দেয় কেমন যেন গোল-মেলে ভাব। বিশেষ করে উচ্চ এবং মাঝারি অক্ষাংশ অঞ্চলে। ওই সময় বছরের বেশ বড় একটি সময় ধরে শীতকাল। মাসের পর মাস শীত। শীত যেন কমতেই চায় না। তুলনায় বসন্ত, শরৎ এবং গ্রীষ্ম যেন এই এল, এই গেল। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা পার্থক্য বাড়তে থাকে। দিনে হয়ত বেজায় গরম, রাতে বেজায় শীত। কোন কোন অঞ্চলে সময়ে অসময়ে নামে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। ভূতাত্ত্বিকরা লক্ষ্য করেছেন, বরফ যুগ শুরু হওয়ার আগে এমন ধরনের আবহাওয়াই বিরাজ করত। ইদানীং এই ধরনের আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, পৃথিবীর বুকে আবার বুঝি নেমে আসছে বরফ যুগ।

আরো একটি প্রশ্ন করতে পার: আবহাওয়ায় এমন পরিবর্তন আসে কেন?

তা হলে এ প্রশ্নেরও উত্তর ভূ-বিজ্ঞানীদের কথায় বলি। পৃথিবী তার অক্ষের চারপাশে আবর্তন করে। এই অক্ষটি আবার থাকে হেলে। এর ফলে সূর্য বছরের এক সময় পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের দিকে সরে আসে। তখন সেখানে তার উত্তাপ পড়ে বেশি। আবহাওয়া হয় উষ্ণ। ওই সময় দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যের তাপ কমে। সেখানের আবহাওয়া শীতল হয়। এসব কথা ভূগোলের বই-এ তো তোমরা পড়েছ। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো? ওই যে বললাম, পৃথিবীর অক্ষ খানিকটা হেলে থাকে। যত গোলমাল এখানেই। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, অক্ষের এই হেলে থাকাটা সব সময় একই রকম হয় না। কখনো কখনো সূর্য এবং বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পৃথিবীর অক্ষ তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কিছুটা বেশী হেলে যায়, অথবা কম হেলে। গ্রহ উপগ্রহ সবাই তো নিজ নিজ পথ ধরে ঘুরছে। তারা যখন বিশেষ বিশেষ অবস্থানে এসে হাজির হয়, মাধ্যাকর্ষণের টান তখন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। আর তখনই তাদের প্রভাব

বেশি করে পড়ে পৃথিবীর উপর। পৃথিবীর অক্ষ হেলে যায়। এমনটি ঘটলে পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধে পর্যায়ক্রমে চলে দীর্ঘ শীতকাল। জলহাওয়ার পরিবর্তন হয়। অবশ্য জল হাওয়ার পরিবর্তনের জন্য মানুষও দায়ী। গাছ-পালা কেটে ফেলার দরুণ পৃথিবীর বহু অঞ্চলে মাটি আলগা হয়ে গেছে। একটু বাতাস বইলেই শুরু হয় ধুলি ঝড়। ধুলি কণা বাতাসে ভর করে ঊর্ধাশ্বাসে ভাসতে থাকে। ভাসমান ধূলিস্তর সূর্যের আলো পৃথিবীর বুজে আসতে আংশিক বাধা দেয়। এতে করেও পৃথিবীর আবহাওয়ার তাপমাত্রা কিছুটা কমে। তা ছাড়া কাঠ, কয়লা এবং জ্বালানি তেল প্রচুর পরিমাণে পোড়ানোর দরুণ বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণও বেড়েছে আগের তুলনায় অনেকটা। এর ফলেও পৃথিবীর আবহাওয়ার তাপমাত্রা বেড়েছে। তাপমাত্রা বাড়ায় বেড়েছে সাগর মহা-সাগর এবং নদীনালার জলের বাষ্পীভবন। সেই জলীয় বাষ্প হাওয়ায় ভেসে মেরু অঞ্চলে গিয়ে সৃষ্টি করছে অতিরিক্ত বরফ।

যাই হোক। ভবিষ্যতের কথা বাদ দিলেও, একটা কথা ঠিক, গত দশ লক্ষ বছরে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল কম করেও দশটি বড় রকমের বরফ যুগ। শেষ বরফ যুগ শুরু হয় এক লক্ষ বছর আগে। আজ থেকে 18000 বছর আগে সেই যুগ চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। আর শেষ? সেও প্রায় 10000 বছর হল।

সেই বরফ যুগে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল বড় বড় বরফের পাহাড়ে ঢেকে গিয়েছিল। বরফের পুরু আস্তরণে ঢাকা পড়েছিল বিস্তৃত অঞ্চল। কোথাও কোথাও 10000 ফুট পুরু বরফের স্তর। বহু নদীর জল তখন জমাট বরফ। স্থলভাগ থেকে সমুদ্রে আর জল পড়ে না। এর ফলে সমুদ্রের গভীরতা কমে যায়। যে সব অঞ্চল সমুদ্রের নীচে সব সময় ডুবে থাকত, সে সব অঞ্চল জলের উপর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

যেমন, যেখানে এখন নিউইয়র্ক শহর সেই জায়গাটি তখন কয়েকটি পুরু বরফের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। সমুদ্র সরে গিয়েছিল অনেক দূরে। মেকসিকোর উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপগুলির আবহাওয়া কিছুটা উষ্ণ ছিল। গ্রীষ্মে ওই সব অঞ্চলে বাতাসের আর্দ্রতা যেত বেড়ে। শীতে বৃষ্টি পড়ত অঝোরে। শীত পড়ত ভীষণ।

হ্যাঁ, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে এখন প্রবাহিত ইংলিশ চ্যানেল। 18000 বছর আগে এই ইংলিশ চ্যানেল পুরোপুরি গিয়েছিল শুখিয়ে। ইংলণ্ডের বড় রকমের অংশ তুষারের নিচে ঢাকা। আগ্রাসী হিমবাহ ইউরোপের উত্তরাঞ্চল থেকে এগিয়ে এসে ঢেকে দিয়েছিল আজকের হামবুর্গ, বার্লিন এবং ওয়ারশ। আর আলপসে জাম ওটা হিমবাহ ছড়িয়ে পড়ে ম্যুনিখ, জেনিভা, জুরিখ- সালসবুর্গ এবং ইনসব্রুকে। যেখানে বরফ ছিল না, মাটি বলতে দো-আঁশ মাটি, সেখানে ছিল খাসা প্রাণী বলতে প্রধানতঃ শামুক। ওই সব অঞ্চলে কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্থি পাওয়া যায় নি। সম্ভবত তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েছিল। তবে ভিয়েনায় পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষের অস্থি পাওয়া গেছে। যারা আজ থেকে 25000 বছর আগে অতিকায় প্রাণী শিকার করে জীবিকা চালান। ভিয়েনার আবহাওয়া তখন ছিল এখন-কার উত্তর কানাডার যে অংশ সুমেরু বৃত্তের মধ্যে পড়ে, সেখানকার মত হিম শীতল।

এশিয়া এবং সাইবেরিয়ার অবস্থা এখনকার মতই ছিল। বৃষ্টি কম। হিমবাহ কিছুটা থাকলেও; কম। সাইবেরিয়ার উত্তরে সুমেরু বৃত্তের মধ্যে ছিল হিমবাহ। সেখানকার হ্রদগুলি জমে নিরেট বরফে পরিণত হয়। হিমবাহর নিচে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে অতিকায় প্রাণীর দেহাবশেষ। কেউ কেউ মনে করেছিলেন বরফ যুগ যখন প্রবল হয়ে ওঠে, সেই 18000 বছর আগে, তারা মারা পড়ে। পড়ে তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে জানা গেছে, আসলে তারা মারা গেছে প্রায় 30000 বছর আগে। যখন সেখানকার আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ছিল। ভেনিস শহর এখন জলের উপর ভাসছে। কিন্তু সেই বরফ যুগে ভেনিস থেকে আড্রিয়াটিক সাগরের দূরত্ব ছিল 300 কিলোমিটারের মত। পশ্চিম ইটালির দিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা ছিল 55 ডিগ্রি ফারেনহাইট। এখন 75 ডিগ্রি। দক্ষিণ অস্ট্রে-লিয়ার অ্যায়র হ্রদ এখন কত ছোট। জলও লবনাক্ত। কিন্তু ওই সময় এই হ্রদের গভীরতা ছিল গড়ে 70 মিটার, আয়তন 35000 বর্গ কিলোমিটার। জলও লবনাক্ত ছিল না। কুমেরু মহাদেশ বরফে ঢাকা। দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার বাতাস বেশি আর্দ্র, তার তাপমাত্রা কম। ভারতেও একই রকম অবস্থা। অ্যামাজানের বিস্তৃত অঞ্চল মরুভূমি গ্রাস করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি বিষুব রেখার দিকে এগিয়ে এসেছিল। কঙ্গো নদীর অববাহিকাও মরুভূমি গ্রাস করে। গালফ স্ট্রিম বা উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত গরম নয় ঠাণ্ডা।

অতএব বুঝতেই পারছ, যদি আবার বরফ যুগ আসে পৃথিবীর চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে।

বিজ্ঞান শিবির

'দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর উদ্যোগে অষ্টম বার্ষিক নিখিল বঙ্গ বিজ্ঞান ও শিল্প শিবির আলিপুর অডিওভিজুয়াল সেন্টারে শুরু হয় এবং শেষ হয় 26 জানুয়ারী, 84 তারিখে। বিভিন্ন জেলার স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন বিজ্ঞান মডেল এই বিজ্ঞান শিবিরে প্রদর্শিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান মডেল তৈরির মাধ্যমে বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তোলা। এই শিক্ষা শিবিরে পশ্চিমবাংলার নয়টি জেলা থেকে চল্লিশটি মডেল নিয়ে পঞ্চাশজন প্রতিনিধিসহ স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যোগদান করে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর বাসন্তীদুলাল নাগ চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সের অধিকর্তা ডক্টর এ. কে. বড়ুয়া।

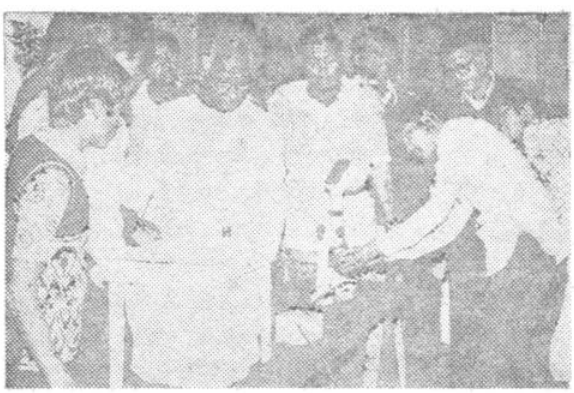

পরিবেশ মন্ত্রী ও বিজ্ঞান শিবির সভাপতি শ্রীভবানী মুখার্জি তরুণদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখছেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার জন্যে তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখককে সম্মানপত্র, পদক ও নগদ অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরনাথ রায় এবং ডক্টর বরুণকুমার চক্রবর্তী। বিজ্ঞান পত্রিকা "উৎস মানুষ"-এর প্রকাশক সম্পাদককেও অনুরূপভাবে সম্মানিত করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন ডঃ বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী।

এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর কর্মকর্তা শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী, শ্রীসুনীত রায়। প্রধান অতিথি ডক্টর এ. কে. বড়ুয়া, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ বি. ডি. নাগচৌধুরী, খ্যাতনামা বিজ্ঞান লেখক শ্রীঅমরনাথ রায় এবং আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী। (নিজস্ব সংবাদদাতা)

মালদা জেলা বিজ্ঞানমেলা '84

BITM এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এবং আঞ্চলিক বিজ্ঞান মিউজিয়ামের পরিচালনায় মালদা জেলা বিজ্ঞানমেলা '84 অনুষ্ঠিত হয় শহরের চিন্তামণী গার্লস স্কুলে। 30 জানু ঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশৈলেন সরকার এবং চিন্তামণী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী লতিকা সেনগুপ্তা। তিনদিনের এই মেলার মাঝের দিন (31 জানুঃ) দুপুরে 'মালদহ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের গবেষণা এবং জেনেটিকস্ নিয়ে আলোচনা করেন মালদা কলেজের দুইজন প্রথিতযশা অধ্যাপক। অনুষ্ঠানের শেষদিনে 10 ফেব্রুঃ বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী লতিকা সেনগুপ্তা এবং শ্রীমতী পূর্ণিমা চ্যাটার্জী। এই বিজ্ঞান মেলায় সর্বমোট 36টি মডেল প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে 33 টি মডেলের নির্মাতারা এসেছেন 13 টি বিভিন্ন স্কুল থেকে এবং বাকি 3টি মডেল তিনটি সায়েন্স ক্লাবের সদস্যরা প্রদর্শন করেন। স্কুলবিভাগে প্রথম হ'ন বার্লোবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী নিবেদিতা চ্যাটার্জী। তাঁর মডেলের নাম ছিল Thermal Power Project এবং ক্লাব বিভাগে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন মেঘনাদ সাহা সায়েন্স ক্লাবের শ্রীজয়সূর্য সাহা। এঁর মডেলটি ছিল Auto matic garden watering। এবারে প্রদর্শিত মডেলের সংখ্যা গতবারের চেয়ে কম ছিল তাছাড়া দর্শকদের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি এই মেলা। দেবব্রত রায়

বিজ্ঞান প্রসারে

দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের অষ্টম নিখিলবঙ্গ বিজ্ঞান ও শিল্প শিবিরের প্রথম প্রস্তুতি সভা ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিজ্ঞানের প্রসার এবং অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞানের সম্প্রসারণের কথা বলেন অ্যাসোসিয়েসানের চেয়ারম্যান ও পরিবেশ মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডঃ তারকমোহন দাস, ডঃ এ, কে, বড়ুয়া, ডঃ এ, এস, ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

বরুণ মজুমদার

মিষ্টি হাত !

একজন লোক মিষ্টি কথা বলতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজেই কি মিষ্টি হতে পারেন? পুনের জানুদাস গায়কোয়াড় নামে একজন যুবক দাবী করেছেন যে, তিনি যা কিছু স্পর্শ করেন তাই মিষ্টি হয়ে যায়। এক গ্লাস জলে কয়েক সেকেণ্ড আঙুল ডোবালেই তা সরবতের মতো মিষ্টি হয়ে যায়। একটা পেন বা রুমাল অথবা যে কোনো জিনিষ হাতে কোরে কিছুক্ষণ ডললে তা চিনির মতো মিষ্টি হয়ে যায়। এটা কি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা না একটা ধোকাবাজী?

ঐ যুবকটি জানিয়েছেন যে, একবছর আগে তিনি এ ব্যাপারটা লক্ষ্য কোরে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তার বহুমূত্র রোগ হয়েছে আশঙ্কা কোরে তিনি সোজা ডাক্তারের কাছে গেলেন। কিন্তু ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বলেন যে, তিনি অন্য পাঁচজন সুস্থ লোকের মতোই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন তার এই লক্ষন ফুটে উঠেছে তা কেউই বলতে পারলেন না। যুবকটি বলেছে যে, যদিও তার ক্ষেত্রে এইরকম ঘটনা ঘটছে, তবুও এটাকে তিনি কোনো দৈবশক্তি বলে মনে করেন না। তিনি কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতে চান, ঐ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করতে চান না।

উইপোকা সমাচার

আমরা যদি প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করি, তবে তার থেকে আমাদের রেহাই নেই। আমাদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে, একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বন সাফ করার ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ উঁই পোকার ঢিবি জন্মেছে। এই উঁইপোকাগুলি যদি প্রচুর পরিমাণে জন্মায় তা হলে অবস্থাটা কি হবে! পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জ্বলন্ত কয়লা এবং তেল থেকে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, উইপোকারা তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত কোরে পরিবেশকে দূষিত করতে পারে। একটা হিসাবে দেখা যায় যে, উঁইপোকারা প্রত্যেক বছর 5 কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং 15 কোটি টন মিথাইল গ্যাস ছাড়ে। এর ফলে বায়ু যে কি পরিমাণ দূষিত হয়, তা বলে বোঝানো যাবে না। গাছ কেটে ফেলার ফলে এই উইপোকারা গাছের খণ্ড খেয়ে বিরাট বাসা বাঁধে, গড়ে তোলে তাদের বিরাট বিরাট কলোনী।

সংবর্ধিত হল কৃতী ছেলেমেয়েরা

একটু দেরীতে হলেও অন্যান্য বছরের মতো এবারও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 1983 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন 7 ফেব্রুয়ারী, প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার হলে। পরীক্ষায় প্রথম কুড়িটি স্থানাধিকারী ছাড়াও প্রতি জেলার ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে যারা প্রথম স্থান দখল করেছে—তাদেরকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে পর্ষদ এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে বিভিন্ন পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করা হয় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে। পাঁচ হাজার, তিন হাজার ও দু'হাজার টাকা যথাক্রমে প্রথম আশিসতনু রায়, দ্বিতীয় রাজীবরঞ্জন ভট্টাচার্য ও তৃতীয় স্থানাধিকারী অনির্বান কুণ্ডুকে দেওয়া হয়। এছাড়া সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বই ও মানপত্রে ভূষিত করা হয়। শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ এবং কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার পক্ষ থেকে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বই উপহার দেওয়া হয়। পুরস্কৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল সাতচল্লিশ।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতিবসু, শিক্ষামন্ত্রী (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) শ্রী কান্তি বিশ্বাস ও পর্ষদ সভাপতি শ্রীভবেশ মৈত্র প্রমুখেরা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার সাথে সাথে দেশের কল্যাণের কথাও সকলের ভাবতে হবে। ইংরেজী শেখারও প্রয়োজন রয়েছে। তাই বলে মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে নয়। মাতৃভাষায় শিক্ষার আসল রূপটি নিহিত রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। মাতৃভাষাকে আঁকড়ে ধরে উচ্চ-শিক্ষালাভের পথে এগোতে হবে। আন্তর্জাতিক নয়, একটি সমৃদ্ধশালী ভাষারূপে তিনি ইংরেজীকে চিহ্নিত করেছেন। শুধু ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে নয় যোগ্য নাগরিক হ'য়ে দেশের কাজে লাগতে হবে—বলেন শ্রী কান্তি বিশ্বাস। তিনি আরো বলেন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ হবে যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়ান—তাদের উত্তরণের পথে পৌঁছে দেওয়া।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন খড়দা প্রিয়নাথ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। ফুল ও চন্দনের ফোঁটা দিয়ে কৃতী ছাত্রী এবং ছাত্রদের বরণ করা হয়। সমাপ্তি ভাষণ দেন শ্রীভবেশ মৈত্র॥ নিজস্ব প্রতিনিধি

পরলোকে বিভুদান রায়চৌধুরী

খ্যাতনামা লেখক সাহিত্যিক বিভুদান রায়চৌধুরী গত 15- জানুয়ারী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল 64। উপন্যাস, ছোটগল্প,বিজ্ঞানও শিশুসাহিত্যের উপর তিনি বেশ কিছু পুস্তক লিখে গেছেন। 'প্রিয়া ও পৃথিবী', 'স্বপ্নমারীচ', 'শেষ দৃশ্যে অন্ধকার তবু' প্রভৃতি বই তার রচনা। সম্পাদনা করেছেন, সমীক্ষা, বিশশতক, একক। কল্লোল যুগের এই সাহিত্যিক অনেক সংগঠন এবং সমাজ সংস্কার মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বসন্তের আকাশ

বিমান বসু

মেষ ও বৃষের পরে রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি মিথুন রাশি বা জেমিনি (Gemini) রয়েছে-কালপুরুষের উত্তর পূবে। বসন্তের আকাশে একে দেখতে পাবে প্রায় মাথার ওপরে।

মিথুন রাশিকে চিনতে হলে প্রথমেই এর দুটি উজ্জ্বল তারাকে চিনে নিতে হবে। কালপুরুষের বাণরাজা ও আর্দ্রা

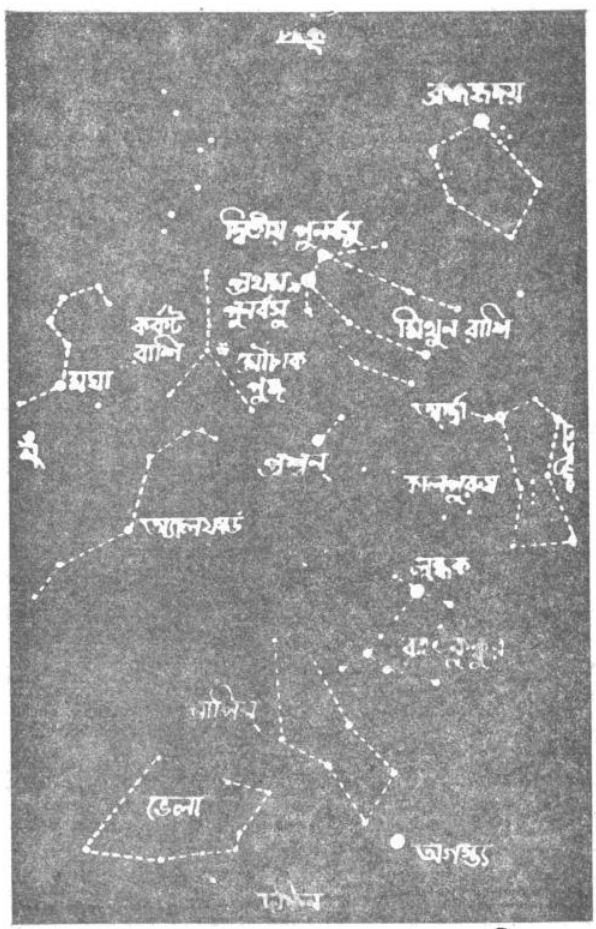

বসন্তের আকাশ

তারাদুটিকে যোগ করে সেই রেখাটি যদি উত্তর পূব বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলেই এদের খুঁজে পাবে। তারাদুটির যেটি বেশী উজ্জ্বল (রাশির খ তারা) সেটির নাম প্রথম পুনর্বসু বা পোলাক্স (Pollux)। প্রথম প্রভার হলদে রং এর এ তারাটি রয়েছে পৃথিবী থেকে 35 আলোকবর্ষ দূরে। প্রথম পুনর্বসুর পশ্চিমের তারাটি মিথুন রাশির ক-তারা, নাম দ্বিতীয় পুনর্বসু বা ক্যাস্টর (Castor)। এটি দ্বিতীয় প্রভার তারা, পৃথিবী থেকে দূরত্ব 45 আলোক বর্ষ। শুধু চোখে দেখে দ্বিতীয় পুনর্বসুকে একটি তারা বলেই মনে হয়। আসলে কিন্তু এটি যুগ্ম তারা। ছোট দূরবীনে বা বাইনোকুলারে দ্বিতীয় তারাটি চোখে পড়ে। প্রথম পুনর্বসুকে চান্দ্র নক্ষত্র পুনর্বসু হিসেবে ধরা হয়।

মিথুন রাশির গ-তারাটিও বেশ উজ্জ্বল এবং সহজেই চোখে পড়ে। 2·2 প্রভার তারাটিকে দেখা যায় আর্দ্রা ও প্রথম পুনর্বসুর ঠিক মাঝখানে।

মিথুনরাশির বাকি তারাগুলি যদিও খুব একটা উজ্জ্বল নয়, আকাশ পরিস্কার থাকলে তাদেরও সহজেই খুঁজে নিতে পারবে। সব মিলে তারামণ্ডলটিতে দুটি মানুষের আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে। পুনর্বসু দুটি মধ্যগমন করে ফাল্গুনের মাঝামাঝি রাত 9টা নাগাদ এবা 15ই অগ্রহায়ণ ভোর তিনটে নাগাদ।

মিথুনরাশির দক্ষিণে কিছু দূরে যে উজ্জ্বল তারাটি চোখে পড়ে সেটির নাম প্রশ্বন্ (Procyon), প্রভা 3 1। যে তারামণ্ডলে এটি রয়েছে সেটি খুবই ছোট, নাম ছোট কুক্কুরমণ্ডল বা ক্যানিস্ মাইনর (Canis Minor)। প্রশ্বন্ ছাড়া তারামণ্ডলটিতে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। এক খ-তারাটির প্রভা 3.1। প্রশ্বন্ মধ্যগমন করে ফাল্গুনের মাঝামাঝি রাত 9টা নাগাদ এবং অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি ভোর তিনটে নাগাদ।

ছোট কুক্কুরমণ্ডলের দক্ষিণে রয়েছে বৃহৎ কুক্কুরমণ্ডল বা ক্যানিস্ মেজর (Canis Major)। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধক রয়েছে এই তারামণ্ডলেই। লুব্ধকের বিষয় আগে কিছু বলেছি, তবে আরো কিছু বলার আছে।

লুব্ধকের বৈশিষ্ট্য এর অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য। রাতের আকাশে তারাটির ঔজ্জ্বল্য অনেক সময় চোখ ধাঁধানো মনে হয়। কখনও কখনও একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ত তোমাদের চোখে পড়বে। লুব্ধক যখন দিগন্তের কাছাকাছি থাকে তখন মনে হয় তারাটি যেন থেকে থেকে রং বদলাচ্ছে। কখনও সে দেখায় উজ্জ্বল নীল রং এর কখনও লাল আবার কখনও বা সবুজ রং এর। ব্যাপারটা অনেকটা

হীরের আংটিতে আলো পড়লে যেমন দেখায় তেমন মনে হয়। আসলে কিন্তু সেরকম কিছু নয়। অমনটা হয় কেবলমাত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পরিবর্তনের দরুন।

লুব্ধকের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যের দরুণ একে কখনও কখনও দিনের আকাশেও দেখা সম্ভব। শুনে হয়ত তোমরা অবাক হবে, কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নেই। দিনের আকাশে চাঁদকে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তৃতীয়া বা চতুর্থীর ফালি চাঁদকেও নীল আকাশে পরিস্কার দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং দিনের আকাশে লুব্ধককে দেখতে পাওয়াটাও যে অসম্ভব নয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। অবশ্য এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। দিনের আলোয় লুব্ধককে খুঁজে বের করতে হলে আকাশের ঠিক কোথায় দেখতে হবে সেটা অবশ্যই জানা চাই, নইলে তাকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ছোট দূরবীন বা অপেরা গ্লাস হলে আরও ভাল হয়।

লুব্ধক ছাড়া বৃহৎ কুক্কুরমণ্ডলের বেশ কয়েকটি তারা সহজেই চোখে পড়ে। তাদের নিয়ে তারামণ্ডলটিতে একটি কুকুরের আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। তোমরাও হয়ত তাকে চিনে নিতে পারবে। পৌরাণিক কাহিনীতে কুকরটি কালপুরুষেরই সঙ্গী, আর সেজন্য তারই পাশে একে দেখা যায়।

রাশিচক্রে মিথুনের পরের রাশি কর্কট বা ক্যান্সার (Cancer)। তারামণ্ডলটিতে একটিও উজ্জ্বল তারা নেই বলে একে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রভার তারা নিয়ে তৈরী তারামণ্ডলটিতে একটি কাঁকড়ার আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। তবে আকাশ খুব পরিস্কার না থাকলে কিছুই চোখে পড়ে না।

তারামণ্ডলটিতে একটি সুন্দর তারাপুঞ্জ আছে, নাম Praesepe বা মৌচাক তারা পুঞ্জ। আকাশ পরিস্কার থাকলে শুধু চোখেই হয়ত এটিকে দেখতে পাবে। শুধু চোখে দেখে মনে হয় আবছা আলোর ছোপ, কিন্তু ছোট দূরবীনে আলাদা আলাদা তারাগুলিকে দেখা যায়। চোখে পড়ে প্রায় গোটা চল্লিশেক তারা। পৃথিবী থেকে মৌচাক পুঞ্জটির দূরত্ব 500 আলোকবর্ষ।

কর্কট রাশির ঘ-তারাটি চান্দ্র নক্ষত্র পুষ্যা। অনেকে অবশ্য মৌচাকপুঞ্জকেই পুষ্যা বলে মনে করেন। মৌচাকপুঞ্জ মধ্যগমন করে পয়লা চৈত্র রাত 9টায় এবং অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি ভোর চারটে নাগাদ।

কর্কট রাশির পরের রাশি সিংহ। একে দেখতে পাবে কর্কট রাশির ঠিক পরে। সিংহ রাশির যে তারাটি টপ্ করে চোখে পড়ে তার নাম মঘা, বিদেশী নাম রেগুলাস্

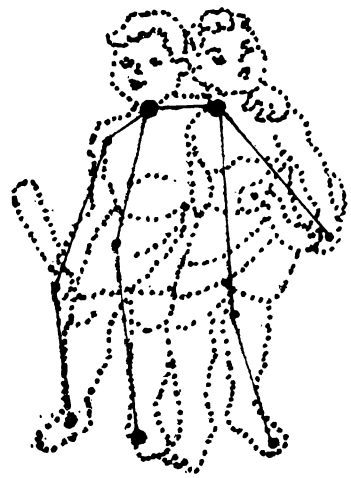

মিথুন রাশি

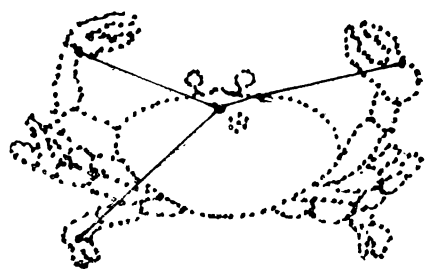

কর্কট রাশি

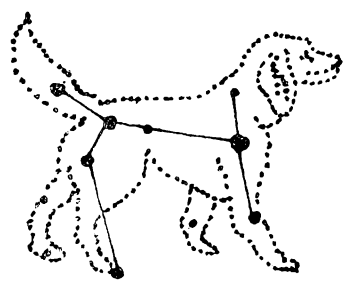

বৃহৎ কুক্কুট মণ্ডল

(Regulus)। এর প্রভা 1·36, মানে তারাটি বেশ উজ্জ্বল। মঘার বৈশিষ্ট্য এটি রয়েছে ক্রান্তিবৃত্তের ঠিক ওপরে। পৃথিবী থেকে তারাটির দূরত্ব 84 আলোকবর্ষ।

মঘাকে চিনতে হলে ছ'টি তারা নিয়ে তৈরী 'কাস্তে'র আকৃতিটা খুঁজে নাও, তাহলেই হবে। মঘাকে ভালভাবে চিনে নিলে কর্কট রাশিকে সহজেই খুঁজে পাবে কারণ কর্কট রাশি রয়েছে মঘা ও পুনর্বসু তারাগুলির ঠিক মাঝামাঝি।

মঘা মধ্যগমন করে চৈত্রের শেষের দিকে রাত 9টা নাগাদ এবং পৌষের মাঝামাঝি ভোর চারটে নাগাদ।

মঘার দক্ষিণে, একটু পশ্চিমের দিকে, দ্বিতীয় প্রভার একটি তারা দেখতে পাবে। তারাটির নাম অ্যালফার্ড (Alphard) এটি রয়েছে জলসর্প বা হাইড্রা (Hydra) তারামণ্ডলে। জলসর্প তারামণ্ডলটি বিস্তীর্ণ। কর্কটরাশির ঠিক দক্ষিণ থেকে তুলারাশি পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। কিন্তু অ্যালফার্ড ছাড়া এতে আর দেখবার কিছু নেই। তারা-মণ্ডলের চ-তারাটি চান্দ্র নক্ষত্র অশ্লেষা।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে বৃহৎ কুক্কুর মণ্ডলের দক্ষিণ পূর্বে দুটি তারামণ্ডল হয়ত চোখে পড়বে। তাদের নাম পাপিস্ (Puppis) এবং ভেলা (Vela)। দুটিই দক্ষিণ আকাশের তারামণ্ডল, সেজন্য দিগন্তের বেশী ওপরে কখনই ওঠে না। মধ্যগমনের সময় পাপিস্‌কে দেখতে পাবে অগস্ত্য তারার ঠিক উত্তরে। ভেলা রয়েছে অগস্ত্যের পূবে। [ক্রমশঃ]

7/UF কলেজ রোড, নয়া দিল্লী-1

অন্যোন্যক সংখ্যার মজা

সজল চক্রবর্তী

কোন সংখ্যার অন্যোন্যক সংখ্যা বলতে আমরা বুঝবো

$$= \frac{1}{\text{সেই সংখ্যা}}$$

যেমন 2 এর অন্যোন্যক $= \frac{1}{2}$

3 এর অন্যোন্যক $= \frac{1}{3}$

এখন তোমাদের অন্যোন্যক সংখ্যার একটা মজা দেখাচ্ছি। মজাটা হ'চ্ছে, কোনো সংখ্যার অন্যোন্যক, সেই সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যার অন্যোন্যকের একঘাত, দ্বিঘাত, ত্রি-ঘাতের সমষ্টির প্রায় সমান।

উদাহরণ ঃ 2 এর অন্যোন্যক $= \frac{1}{2}$

এখন '2' এর পরবর্তী সংখ্যা $= 3$

3'এর অন্যোন্যক $= \frac{1}{3}$

তাহ'লে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে,

$(\frac{1}{2}) \simeq (\frac{1}{3})^1 + (\frac{1}{3})^2 + (\frac{1}{3})^3$ [প্রায় সমান চিহ্ন $\simeq$]

ঠিক একই ভাবে,

$(\frac{1}{3}) \simeq (\frac{1}{4}) + (\frac{1}{4})^2 + (\frac{1}{4})^2 + (\frac{1}{4})^3$

$(\frac{1}{4}) \simeq (\frac{1}{5}) + (\frac{1}{5})^2 + (\frac{1}{5})^3$

এবার হাতে কলমে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক ঃ

$\frac{1}{3} + (\frac{1}{3})^2 + (\frac{1}{3})^3$

$= \frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{27}$

$= \frac{9+3+1}{27}$

$= \frac{13}{27}$

$\simeq \frac{13}{26}$

$= \frac{1}{2}$

কিন্তু কেন হয়?

সাধারণ ভাবে, যে কোন সংখ্যা 'n' নাও,

তাহ'লে $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3}$

$= \frac{n^2+n+1}{n^3}$

$= \frac{1}{\frac{n^3}{n^2+n+1}}$

$= \frac{1}{\frac{n^3-1}{n^2+n+1} + \frac{1}{n^2+n+1}}$

$= \frac{1}{(n-1) + \frac{1}{n^2+n+d_1}}$

$= \frac{1}{(n-1)} + \frac{1}{n^2+n+1}$

$\simeq \frac{1}{n-1}$ [$\frac{1}{n^2+n+1}$ কে অগ্রাহ্য করে।]

অর্থাৎ $\frac{1}{n-1} \simeq \left(\frac{1}{n}\right)^1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^3$

এবং প্রকৃত সমীকরণ হ'চ্ছে—

$$\frac{1}{n-1} = \left(\frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^3 + \cdots$$

অসীম সংখ্যক পদ পর্যন্ত

অর্থাৎ $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + (\frac{1}{3})^2 + (\frac{1}{3})^3 +$ অসীম সংখ্যক পদ পর্যন্ত

তাহ লে বুঝতে পারছো, অন্যোন্যক সংখ্যাগুলোও বেশ মজার!

3-কে, নস্কর পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-31

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

আর্কিমিডিস

চৈতালী ঘোষ

'কোন অদ্রবণীয় বস্তু যদি তরল পদার্থের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করা হয় তবে সেই অদ্রবণীয় বস্তুটির ওজন কিছুটা হ্রাস পায়।'—এই সূত্রটি বিজ্ঞানের একটি অবিস্মরণীয় আবিষ্কার। যিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম আর্কিমিডিস্। সেজন্যে এই বহুল প্রচলিত সূত্রটি 'আর্কিমিডিসের সূত্র' নামে পরিচিত।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় দুশো সাতাশি বছর আগে, সিরাকিউজ নগরে এই বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আবিষ্কৃত বহু তত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিক মহলে বেশ মূল্যবান সম্পদ। তবে পদার্থের ওজন সম্বন্ধীয় তাঁর বহুল প্রচলিত এই তত্ত্বটির পেছনে একটি কাহিনী কথিত আছে।

আজ থেকে প্রায় বাইশ শো বছর আগে সিসিলির সিরাকিউজ নগরের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় হায়রো। তিনি একবার তাঁর নিজের জন্যে একটি সোনার মুকুট তৈরীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজার আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে এক নামী স্বর্ণকারকে তাঁর কাছে আনা হলো। এবং সেই স্বর্ণকারকে মুকুট তৈরীর জন্য একতাল সোনাও দেওয়া হয়। কিছুদিন পর সেই মুকুট তৈরী করে স্বর্ণকার রাজার কাছে এসে হাজির হলেন। দেখে রাজা খুশী হলেন বৈকি। কিন্তু মুকুটটি প্রকৃতই বিশুদ্ধ সোনার কি না, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ থেকে গেল। অথচ মুকুটটা না ভেঙে কি করে তা পরীক্ষা করবেন এমন কোন উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না।

আর্কিমিডিস ছিলেন সিরাকিউজ নগরেরই নাগরিক। বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি তখন বেশ খ্যাতি লাভ করেছেন। সুতরাং রাজা হায়রো তাঁকেই ডেকে পাঠালেন এই পরীক্ষা করবার জন্য। আর্কিমিডিস এলেন। এবং ব্যাপার বুঝে খুবই চিন্তায় পড়লেন। বেশ কিছু দিন ধরে তিনি ব্যাপারটি নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। বহুবিধ উপায় অবলম্বন করেও তিনি কিছুতেই সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। এইভাবে চিন্তামগ্ন অবস্থায় বেশ কয়েকদিন কাটাবার পর একদিন তিনি স্নান করতে করতে এর উপায় পেয়ে গেলেন। স্নান করবেন বলে যখনই তিনি চৌবাচ্চায় নামলেন তখনই দেখলেন, কানায় কানায় ভর্তি চৌবাচ্চাটি থেকে কিছু জল উপচে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুঁজে পেলেন এক সূত্র। তিনি বুঝলেন, যে, কোন আকৃতির বস্তুকে এইভাবে জলে নিমজ্জিত করে তার দ্বারা তাপ সারিত জলের আয়তনের সাহায্যে তার সঠিক আয়তন নির্ণয় করা যায়। এই সূত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বর্ণকার নির্মিত রাজার সেই মুকুটটি একটি সম্পূর্ণ জলপূর্ণ পাত্রে ডোবালেন। এবং তার ফলে যে জল উপচে মাটিতে পড়ল তা সঙ্গে সঙ্গে

সংগ্রহ করলেন। মুকুটের সমান ওজন বিশিষ্ট খাঁটি সোনার তালটিও তিনি আর একটি জল পূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে তার উপচানো বা তাপ সারিত জলটিও সংগ্রহ করলেন। এবার পৃথক পৃথক দুটি পাত্রে সংগৃহীত জল সাবধানে রেখে দিলেন। এরপর তাপ সারিত জল তিনি আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, তাদের ওজনে অনেক পার্থক্য দেখা গেল। যদি এদের ওজন সমান হত, তবে মুকুটটি খাঁটি সোনার ওজনেই হত। অর্থাৎ এই অসমান ওজন দেখেই তিনি প্রমান করলেন, যে, সোনার মুকুটিতে সোনার সঙ্গে ভেজাল মিশ্রিত করা হয়েছে। এই অভাবনীয় সূত্র আবিষ্কারের ফলে সেদিন আর্কিমিডিস স্নানাগার থেকে প্রায় অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটে গেলেন। আনন্দে তখন তিনি অভিভূত। রাজার কাছে গিয়ে তিনি সবই প্রকাশ্যে বলেছিলেন, এবং পরীক্ষা করেও দেখিয়েছিলেন। রাজাও বিস্মিত হয়ে গেলেন! এবং স্বর্ণকারকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। বিচারে তার শাস্তি হলো। এরপর থেকে আর্কিমিডিস রাজা হায়রোর বন্দুর মতো বসবাস করতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে হায়রো তাঁকে খুব শ্রদ্ধাও করতেন। এছাড়া আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীদের মতো আর্কিমিডিস তাঁর প্রতিভাকে যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতেন। কথিত আছে, একবার হায়রোর অনুরোধে আর্কিমিডিস সিরাকিউজ আক্রমনকারী রোমানদের এক বিরাট যুদ্ধ জাহাজ আতসী কাঁচের সাহায্যে ধ্বংস করেন

এছাড়া 'লিভার' আবিষ্কার আর্কিমিডিস-এর একটি বড় কীর্ত্তি। লিভার হলো এমনই যন্ত্র, যার দ্বারা যে কোন ভারী জিনিষ তোলা সম্ভব হয়। এই লিভারও আর্কিমিডিস আবিষ্কার করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রাজ্ঞ মানুষটিকে খুবই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। 212 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে, রোমান সেনাপতি ছিলেন আমেলার সিরাকিউজ। তিনি আর্কিমিডিসকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। এবং তিনি তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন তাঁকে কোন সময় বিরত না করে। দৈব্যক্রমে সেই সব সৈন্যরা কোনভাবে তাঁর আদেশ ভুলে গিয়েছিলেন। একদিন আর্কিমিডিস তাঁর ঘরে একটি জটিল সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ রোমান সৈন্যরা তরবারির আঘাতে তাঁর মস্তক দেহ থেকে ছিন্ন করে দেয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর অবশ্য রোমান সেনাপতিরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, এবং আর্কিমিডিসের মৃতদেহ খুব সম্মানের সঙ্গেই কবর দেওয়া হয়েছিল।

17/এ কার্ত্তিক বোস লেন, কলি-6

অভিনব ফোয়ারা

● চন্দন কুমার নাগ

আজ আমি তোমাদের বিজ্ঞানের একটি ছোট মডেল তৈরীর প্রণালী সম্বন্ধে বলবো, এই মডেলটির সাহায্যে তোমরা দেখতে পারবে কিভাবে কোন সংযোগবিহীন ট্যাপ থেকে অনবরত জল পড়তে পারে। এটা মন্ত্র দ্বারা সম্ভব হয় না। বিজ্ঞানের একটা ছোট্ট কৌশল এখানে ঘটানো হয়েছে।

এর জন্য যে সব যন্ত্রপাতি তোমাদের সংগ্রহ করতে হবে সেগুলি হোল—

(ক) একটি জল সঞ্চয়কারী ট্যাঙ্ক।
(খ) একটি সংযোগ বিহীন ট্যাপ।
(গ) রবারের লম্বা নল।
(ঘ) দুই মুখ খোলা সরু কাচনল। (ঙ) জল (চ) পর্দা।

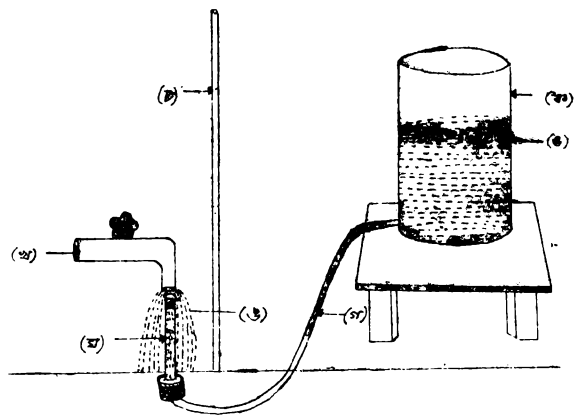

ছবিটি দেখে নিশ্চয়ই মডেলটি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারছ। প্রথমতঃ জল সঞ্চয়কারী ট্যাঙ্কটি খুব উঁচুতে রাখতে হবে। কারণ তোমরা জান জল সমোচ্চশীলতা ধর্মের জন্য সবসময় উঁচু স্থান থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। তাই এই ট্যাঙ্ক থেকে জল রবার নলের মধ্য দিয়ে দুই মুখ খোলা কাচ নলে আসবে। এবং প্রচণ্ড গতিসহ ফোয়ারার আকারে উপরের দিকে উঠবে।

এখন যদি ঐ ফোয়ারার উপরের দিকে একটি সংযোগ বিহীন ট্যাপ স্থাপন করা যায় তাহলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে যেন ঐ ট্যাপ থেকেই কোন মন্ত্রবলে অনবরত জল পড়ছে। এখন নিশ্চয়ই ভাবছ—ঐ কাচ নলটি যখন দর্শকের চোখে পড়বে তখন ওরা তোমার কায়দাটা ধরে ফেলবে। কিন্তু না—জলের ও কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক প্রায় এক হওয়ার দরুণ জলের মধ্যেকার কাচনলের অস্তিত্ব ধরা পড়বে না। আর হ্যাঁ—তুমি যেখানে মডেলটি দেখবে সেখান থেকে জল সঞ্চয়কারী ট্যাঙ্কটি পর্দার সাহায্যে আলাদা করে রাখবে। ভুলবে না কিন্তু।

কৌশল্যা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

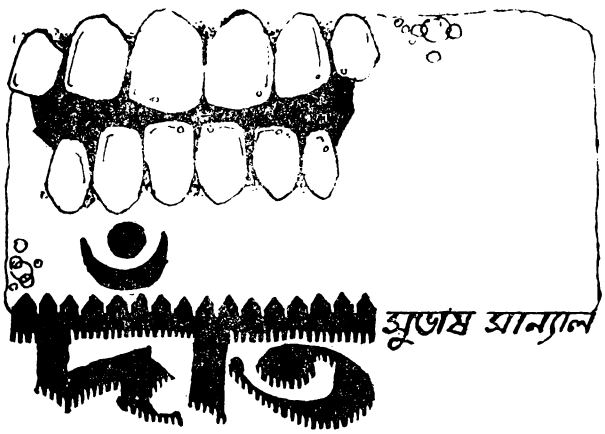

যদি তোমাকে প্রশ্ন করা যায় "আচ্ছা বলো তো তোমার শরীরের সবচেয়ে শক্ত অংশ কোনটা ?" নিঃসন্দেহে তুমি তোমার দাঁতের কথাই বলবে। সত্যি বলতে কি মানুষ মারা যাবার পর মাটি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার দাঁত অবিকৃত থেকে গেছে বছরের পর বছর। এমন কি মৃত্যুর হাজার বছর পরও দাঁত রয়ে গেছে যেমনকারটি তেমনই। এ ঘটনাও বিরল নয়। অথচ সব থেকে দুঃখের কথা হলো যে দাঁত এত শক্ত হলেও মুখের ভেতর থেকেও কিন্তু প্রায়শই বিশ্বাস ঘাতকতা করে। গোটা মার্কিন মুলুকে নাকি এমন স্ত্রী বা পুরুষ খুঁজে পাওয়া শক্ত যিনি জীবনে একবার না একবার দাঁতের ডাক্তারের চেয়ারে বসেন নি। শুধু মার্কিন মুলুকেই কেন, সত্যি কথা বলতে কি গোটা পৃথিবীর মানুষের দাঁতের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই অবনতির দিকে যাচ্ছে। সভ্যতা যতো এগুচ্ছে, দাঁত নিয়েও নানা ঝামেলা ততই বাড়ছে। একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো গত দুটো বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সব দেশের লোকেরা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কিন্তু দাঁতের রোগের উপদ্রবটা কমই ছিল। কারণ সেই সময়টাতে অনেক-কেই আর্থিক অসুবিধা এবং ক্ষুধার তাড়নার রসনা তৃপ্তকর বিবিধ খাবারের পরিবর্তে কাঁচা, সেদ্ধ বা আধ সেদ্ধ খাবার গলঃ ধারণ করতে বাধ্য করেছিল। সুতরাং একটা ব্যাপার আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে খাবার-দাবারের ব্যাপারে আমরা যতই বিলাসী হয়ে উঠছি, আমাদের দাঁতের রোগগুলোও বাড়ছে সেই অনুপাতেই। অবশ্য ঠিক কি কি কারণের জন্য দাঁতের রোগ বাড়ছে তাদের এক, দুই তিন চার নম্বর দিয়ে চিহ্নিত না করা গেলেও বিজ্ঞানীরা আজ একমত যে খাবার পর দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো পচে তৈরী হচ্ছে নানা জীবাণু। যারা কিনা lactic acid তৈরী করে। ঐ lactic acid-এর নানা জটিল বিক্রিয়ায় দাঁতের ওপরের এনামেল খুইয়ে তৈরী করে যন্ত্রণাদায়ক গহ্বর ও তার থেকে নানা দাঁতের উপসর্গ।

কিন্তু এমন লোকের সংখ্যাও তো কম নয় যাঁরা দাঁতের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। নিয়মিত দাঁতের যত্ন নেন ; অথচ তারাও অনেকেই দাঁতের রোগের শিকার হন। এটা কেন ?

কিছুদিন আগে ম্যানচেস্টারের Turner Dental School-এর Dr Levin-এক রিপোর্টে জানিয়েছেন যাঁদের ফলের রস বা হালকা ধরণের মিষ্টি পাণীয়ের প্রতি ঝোঁক বেশী তাঁদের মধ্যে দাঁতের রোগের প্রবণতাও বেশী। এছাড়া যে সব বাচ্ছারা কাঠি-লজেন্স বা জ্যাম-ধরণের খাবার পছন্দ করে তাদেরও দাঁতের ক্ষয় বেশী। ডঃ লেভিনের ধারণা এক্ষেত্রে দাঁতের ক্ষয়ের জন্য দায়ী ঐ সব খাবারে Citric acid ধরণের অম্লের উপস্থিতি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে অ্যাসিড ধরনের রাসায়নিক পদার্থরা দাঁতের এনামেল ক্ষইয়ে দিতে পারে। দাঁতের Calcium-লবণদের গলাতেও এরা ওস্তাদ।

এ ছাড়া যাঁরা পেটের গোলমালে ভোগেন বা যাঁদের অম্লের ধাত আছে তাদেরও কিন্তু দাঁতের রোগের প্রবণতা বেশী।

সুতরাং এটা আজকাল পরিষ্কার যে দাঁতের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে শুধু দাঁতের যত্ন নিলেই চলবে না, নজর দিতে হবে খাদ্য অভ্যাসের দিকে, সমস্ত শরীরেই যত্ন নিতে হবে।

"দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না"—এ প্রবাদ বাক্যের শিকার যেন আমরা না হই।

পদার্থবিদ্যা

অলক চক্রবর্তী

নিউটনের গতিসূত্র অধ্যায়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা আগেরবার করেছি। এবার আসছি, কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি—এই অধ্যায়ের উপর।

প্রথমেই উত্তরটা দেখো না। একটু ভাবোই না—দেখবে, ভালো লাগবে যখন তোমার ভাবা উত্তরটাই সঠিক হবে।

এসো, সুরু করা যাক্।

প্রশ্ন 1 : একটা ছেলে নদীতে খুব স্রোতের উল্টো-দিকে 75 ফুট/মিনিট বেগে 2 মিনিট ধরে সাঁতার কেটে অনেক চেষ্টা করেও ঘাট থেকে স্রোতের বিরুদ্ধে একটুও এগিয়ে যেতে পারল না। সে কি পরিমাণ কাজ করল?

উত্তর 1 : ঐ ছেলেটার সরণ শূন্য বলে কাজের মানও শূন্য।

প্রশ্ন 2 : একজন মুজুর 10 মিনিটে 12 খানা ইঁট 25 ফুট ওপরে তুলল এবং আরেকজন মজুর 15 মিনিটে 12 খানা ইঁট 25 ফুট ওপরে তুলল। কে বেশী কাজ করল এবং কার ক্ষমতা বেশী? কেন?

উত্তর 2 : দুজনেই সমান সংখ্যক ইঁট সমান উচ্চতায় তুলেছে বলে সমান কাজ করল।

সমান কাজ করতে দ্বিতীয় লোকের বেশী সময় লেগেছে বলে ওর ক্ষমতা প্রথমের চেয়ে কম, অর্থাৎ প্রথম মজুরের ক্ষমতা বেশী।

প্রশ্ন 3 : যেখানে স্থির অবস্থায় গুলি কোন কঠিন বস্তু ভেদ করতে পারে না, সেখানে বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লে তা কি করে কঠিন বস্তু ভেদ করে?

উত্তর 3 : গতির জন্যে গুলি গতিশক্তি লাভ করে বলে কাজ করবার সামর্থ্য লাভ করে। ফলে কঠিন বস্তু ভেদ করতে পারে। স্থিরঅবস্থায় গুলির ঐরূপ শক্তি থাকে না বলে কোন কঠিন বস্তু ভেদ করতে পারে না।

প্রশ্ন 4 : সোজা খাড়াপথে না উঠে বাঁকাপথে ঘুরে পাহাড়ে ওঠা সোজা কেন?

উত্তর 4 : পাহাড়কে ঘিরে যে বাঁকা রাস্তা থাকে তা নততলের মত কাজ করে। দেহের ভারকে কোন নির্দিষ্ট উঁচুতে তুলতে পাহাড়ে খাড়াপথের চেয়ে নততল বরাবর কম বল দেবার দরকার হয়। তাই খাড়াপথে না উঠে বাঁকা পথে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে ওঠা সোজা।

প্রশ্ন 5 : একজন লোক অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে ঘেমে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা ভারী আলমারী একটুও নড়াতে পারল না। কাজের সংজ্ঞা অনুযায়ী তার যদি কোন কাজই না হল, তবে সে ক্লান্ত হল কি করে?

উত্তর 5 : আলমারিটা সরাবার চেষ্টা করবার সময় ঐ লোকটার যে দেহচালনা করতে হয়েছে তাতে যে শক্তি খরচ হয়েছে তার জন্যেই সে ক্লান্ত হয়েছে। সুতরাং খাটা সত্ত্বেও আলমারির ওপর কোন কাজ হয় নি, কারণ আলমারিটা সে একটুও সরাতে পারে নি।

প্রশ্ন 6 : নততলকে একরকমের যন্ত্র বলা যায় কি?

উত্তর 6 : হ্যাঁ, নততলকে একরকমের যন্ত্র বলা যায়। কারণ যন্ত্রের সংজ্ঞা থেকে জানি যে ওটা এমন একধরণের ব্যবস্থা যার সাহায্যে সুবিধেমত বল দিয়ে আমাদের ইচ্ছে মত কাজ করানো যায় এবং সাধারণতঃ যন্ত্র দিয়ে কম বল দিয়ে বেশী বাধা পার করা হয়, অর্থাৎ যন্ত্রের সুবিধে >1 হয়ে থাকে। নততল ঐ দুটো সর্তই পূরণ করে। ওর যান্ত্রিক সুবিধে সব সময়েই >1 হয় $\neq$ এবং সোজাসুজি খাড়া ভাবে তোলার চেয়ে এবং ভারী বস্তুকে নততল দিয়ে ঠেলে বা গড়িয়ে কোন নির্দিষ্ট উচ্চতায় তোলা সহজ হয়। কাজেই নততলকে একরকমের যন্ত্র (সরলযন্ত্র) বলা যায়।

প্রশ্ন 7 : দুজন লোকের একজন তিনখানা ও একজন দশখানা ইঁট নিয়ে একই সময়ে একটা বাড়ীর একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠল। কার ক্ষমতা বেশী? এখানে কি ধরণের কাজ করা হল?

উত্তর 7 : যে লোকটা বেশী ইঁট (দশখানা) নিয়ে ওপরে উঠল তার ক্ষমতা বেশী।

এক্ষেত্রে, অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করা হল।

প্রশ্ন 8 : চলাচলকারী বাতাস হাওয়া কল, পালতোলা নৌকো চালায় কি করে?

উত্তর 8 : চলাচলকারী বাতাসের গতি থাকায় ওটা গতিশক্তি লাভ করে এবং সেই জন্যে কাজ করবার সামর্থ্য লাভ করে। ফলে ওটা হাওয়া কল, পালতোলা নৌকো প্রভৃতি চালাতে পারে।

প্রশ্ন 9 : একটা পাহাড়ের চূড়োয় উঠতে একজন লোকের একঘণ্টা ও অন্য একজন লোকের দেড়ঘণ্টা লাগে। কে কেশী কাজ করে? কেন?

উত্তর 9 : অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে দুজন লোকের সরণ সমান হওয়ায় কাজের পরিমাণ সমান। প্রথম লোকের দেড়গুণ বেশী সময়ে দ্বিতীয় লোক একই কাজ করতে পারে বলে প্রথম লোকের ক্ষমতা দ্বিতীয় লোকের দেড়গুণ।

প্রশ্ন 10 : সমান ভরের দুটো বস্তুর বেগ সমান থাকলে ওদের গতিশক্তিও সমান হয়। কিন্তু একটা বস্তুর

বেগ ঠিক রেখে ভর দ্বিগুণ করলেও অন্যটার ভর ঠিক রেখে বেগ দ্বিগুণ করলে তাদের গতিশক্তি অনুপাত কত হবে ?

উত্তর 10. শতিশক্তি $= \frac{1}{2}mv^2$

(m = বস্তুর ভর, v = ওর বেগ)

প্রথম বস্তুটার ভর $= 2m$, বেগ v হলে ওর গতিশক্তি হবে $\frac{1}{2} 2mv^2$ বা mv^2 ।

দ্বিতীয় বস্তুটার ভর m এবং বেগ $2v$ হলে ওর গতিশক্তি হবে $\frac{1}{2} m (2v)^2$ বা $2mv^2$ ।

তখন ওদের গতিশক্তির অনুপাত হবে

$mv^2 : 2mv^2$ অর্থাৎ $1 : 2$ ।

(দ্বিতীয় বস্তুটার গতিশক্তি প্রথমটার দ্বিগুণ হবে) ।

প্রশ্ন 11 : "বল কাজ করছে" "বলের বিরুদ্ধে কাজ করা হচ্ছে" বলতে কি বোঝ উদাহরণ দিয়ে আলোচনা কর ।

উত্তর 11 : যে বল দেয়া হয় তার দিকে বলের প্রয়োগবিন্দুর সরণ হলে বলা হয় "বল কাজ করছে" কিন্তু প্রয়োগবিন্দুর সরণ যদি যে বল দেয়া হয় তার উল্টোদিকে হয়, তবে বলা হয় "বলের বিরুদ্ধে কাজ করা হচ্ছে।"

উদাহরণ :

একটা চেয়ার ঠেলে সরানো হলে চেয়ারটার ওপর দেয়া বলের দিকে ওর সরণ ঘটে বলে এক্ষেত্রে বল কাজ করছে ।

আবার কোন বস্তুকে মাটি থেকে ওপরে তোলবার সময় পৃথিবী বস্তুটাকে অভিকর্ষ বলে নিচের দিকে টানতে থাকে। সুতরাং বস্তুটাকে ওপরে তুললে ঐ অভিকর্ষবলের বিরুদ্ধে কাজ করা হয় । ঐরূপ কুয়ো থেকে জল তোলার ঘটনাও অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ হওয়ার উদাহরণ ।

সিঁড়ি বেয়ে নীচ থেকে ওপরে ওঠার সময় অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে ও নীচে নামবার সময় অভিকর্ষ বলের দিকে কাজ করা হয় ।

প্রশ্ন 12 : সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে জোরে কোন লোক হেঁটে গেলে কি রকমের কাজ করা হয় ?

উত্তর 12 : সুটকেস খাড়াভাবে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে অনুভূমিক তল বরাবর হেঁটে গেলে সুটকেসটার সরণ যে বল দেয়া হয়েছে সেই বলের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে বলে ওর ওপর কোন কাজ করা হয় না । কারণ, তখন

$$W = F \cos 90^\circ \times s$$
$$= 0 \times S$$
$$= 0 \text{ হয়} ।$$

প্রশ্ন 13: জোরে ঠেলা সত্ত্বেও একটা বড় পাথর সরানো গেল না । এক্ষেত্রে কি পরিমাণ কাজ হল ?

উত্তর 13 : কৃতকাজ = প্রযুক্ত বল × বলের প্রয়োগ বিন্দুর সরণ । এক্ষেত্রে পাথরটার সরণ শূন্য বলে কাজের পরিমাণও শূন্য ।

প্রশ্ন 14 : একটা মজুর 10 খানা ইঁট নিয়ে 30 ফুট উঁচুতে উঠে আবার ঐ ইঁট নিয়েই আগের জায়গায় ফিরে এল । সে কত কাজ করল ?

উত্তর 14 : মজুর প্রথম ও শেষ অবস্থান এক বলে তার সরণ শূন্য, কাজেই পরিমাণও শূন্য ।

প্রশ্ন 15 : একটা ঢিল ওপরে ছোঁড়া হল । ওপরে উঠে ওটা আবার মাটিতে ফিরে এল । এক্ষেত্রে কি রকম কাজ করা হল ?

উত্তর 15 : ঢিলটা যখন ওপরে উঠল তখন অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করা হল । আবার টুকরোটি যখন ওপর থেকে মাটিতে পড়ল তখন অভিকর্ষ-বলের দিকে কাজ করল ।

প্রশ্ন 16 : ঘরের দেয়াল জোরে ঠেললে কি পরিমাণ কাজ করা যাবে ?

উত্তর 16 : ঘরের দেয়ালকে জোরে ঠেললেও ওর সরণ হয় না ; কাজেই সরণ শূন্য বলে কাজের পরিমাণও শূন্য হয় ।

প্রশ্ন 17 : ঘোড়া গাড়ী টানলে কি রকমের কাজ করা হয় ।

উত্তর 17 : ঘোড়া গাড়ি টানলে দেয়া বলের দিকে সরণ ঘটে । সুতরাং এক্ষেত্রে বল কাজ করে । কিন্তু গাড়ীর চাকা ও রাস্তার মধ্যে যে ঘর্ষণবল কাজ করে তা গাড়ীর চলায় বাধা দেয়, সেই ঘর্ষণবলের বিরুদ্ধে ঘোড়ার কাজ করা হয় ।

প্রশ্ন 18 : বাইরের হাওয়ার বিরুদ্ধে কোন জানলার পাল্লা (i) বন্ধ করলে,

(ii) চেপে ধরে রাখলে কি রকম কাজ করা হবে ?

উত্তর 18 : (i) বাইরের হাওয়ার বিরুদ্ধে জানলা বন্ধ করলে পাল্লার সরণ হয় বলে হাওয়ার বলের বিরুদ্ধে কাজ করা হয় ।

(ii) পাল্লাগুলো কেবল চেপে ধরে রাখলে পাল্লার সরণ শূন্য হয় বলে কোন কাজই করা হয় না ।

জয়পুরিয়া কলেজ, কলকতো-5

প্রাণী-বিচিত্রা

বোল চক্রবর্তী

মার্কিন দেশের বিচিত্র এই পাখি! প্রকৃতি একে সুন্দর লম্বা লেজ দিয়েছে, কিন্তু মটমট (motmot) পাখি এতে খুশী নয়, তার নতুন ফ্যাশান চাই। তাই সে নিজের লেজের ডগা ঠোকরাচ্ছে।

ঠুকরে ঠুকরে লেজের ডগার নীচে কতকগুলো পালক ছিঁড়ে ফেলল।

হ্যাঁ, এইবার মনের আনন্দে বসল সে তার ঝুঁপ-ওলা লেজ দুলিয়ে।

প্রাণী-বিচিত্রা

বোল চক্রবর্তী

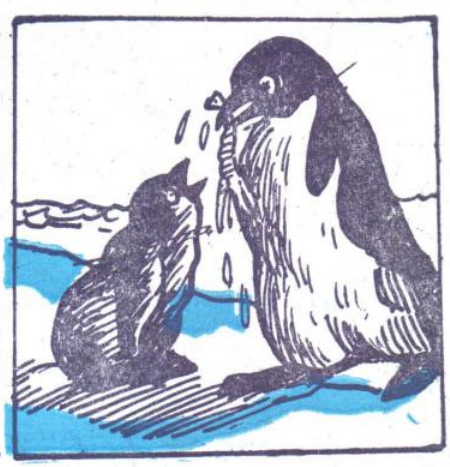

আহা, বাচ্চা পেঙ্গুইনটার খিদে পেয়েছে। মা গেছে শিকারে, বাবাও নেই। কে খেতে দেবে?

ঐতোকে যেন আসছে মুখে একটা চিংড়ি মাছ ধরে।

এ তার মা নয় বাবাও নয়। তাহলে কি! বাচ্চাটা তার কাছে হাঁ করে দাঁড়াতেই সে তাকে খাবার দিল।

মানুষের কি শেখা উচিত নয়?

নটিলাস পূর্ণ উদ্যমে এখন পিছিয়ে চলেছে। তার মানে উত্তরের পথ বন্ধ।
আবার পুরণ এক ধাক্কা।
সর্বনাশ! দক্ষিণের পথও বন্ধ হয়ে গেল!
বন্ধুগণ! আমরা এইঅবস্থায় দু'ভাবে মরতে পারি। এক-বরফের চাপে গুঁড়িয়ে, দুই-অক্সিজেনের অভাবে। এখন মুক্তির একমাত্র উপায়-বরফের প্লাটার ভেঙে ফেলা।
কুড়ুল হাতে শুরু হল বরফ ভাঙার পালা। অ্যারোনেক্স, কনসীল আর নেড ও বসে রইলো না।
যে ভাবে কাজ চলছে তাতে মুক্তি পেতে আরও চারদিন লাগবে
দুটো দিন কেটে গেল--
অক্সিজেন কমে আসছে! বাতাসে কেমন একটা দম আটকানো ভাব! শেষ মুহূর্ত কি তবে আসন্ন?
কয়েকঘন্টা কাজ করার পর অধ্যাপক ফিরে এলেন নটিলাসে
ক্যাপ্টেন, জলের তাপমাত্রা এখন শূন্যের সাত ডিগ্রি নিচে। খুব শীগগিরই চারপাশের জলও জমে যাবে।
সেইটাই তো ভয়অধ্যাপক। এখন গরম জল ঢেলে তাপমাত্রা বাড়াবার চেষ্টা করবো আমরা।
42

বৈদ্যুতিক চুল্লিতে জল গরম করে নলের সাহায্যে ঢালা শুরু হল চারপাশে ...
আমি যদি শ্বাস না নিয়ে বাতাসটুকু আপনার কাজে লাগাতে পারতাম!
আজ ষষ্ঠ দিন। আহ, বুকের ভিতরটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে!
নিমোর শরীরও যন্ত্রণায় অবশ হয়ে আসছে, তবু ধৈর্যের কোন অভাব নেই আশ্চর্য এই মানুষটির।
যাক, বরফের প্রাচীর বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। ধাক্কা মেরে দেখি, মনে হয় পারবো।
কড়-ড়-
আহ, বরফের মৃত্যুফাঁদ আমরা ভেঙে ফেলতে পেরেছি!
গৌতম কর্মকার
তীব্র বেগে ছুটে চললো নটিলাস, এবার উঠতে হবে উপরে।
হা ঈশ্বর, আর কতোক্ষণ!
মাথার উপর পাতলা একটা বরফের আস্তরণ। কাগজের মতো ওটা ছিঁড়ে ফেলে নটিলাস মুখ তুলে উপরে উঠলো।
আঃ বাতাস, কী অপূর্ব তাজা বাতাস!
ক্যাপ্টেন কি নটিলাসকে অতলান্তিক মহাসাগরে নিয়ে যাচ্ছেন?
নটিলাস এবার পূর্ণ গতিবেগে ধেয়ে চললো উত্তরে।
সাগরতলের বৈচিত্র্যময় জীবন-তরঙ্গ প্রফেসর এবং তাঁর সাথীদের মন থেকে একটু একটু করে মুছে দিল তুষাররাজ্যের ভয়ঙ্কর ছবি। কেটে গেল অনেকগুলো দিন।
43

২০শে এপ্রিলের কথা। নটিলাস এগিয়ে চলেছিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কোল ঘেঁষে।
স্যার, ঐ দেখুন কী সাংঘাতিক একটা প্রাণী!
সর্বনাশ! একটা স্কুইড দেখছি ভীষণ বেগে নটিলাসের দিকে এগিয়ে আসছে!
আচমকা পুচণ্ড একটা ঝাঁকুনি, তার পর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নটিলাস।
আমার মনে হয়, নটিলাসের ব্লেডে স্কুইডটা আটকে গেছে। তাই থেমে পড়েছে নটিলাস। মুক্তি পেতে হলে এখনি ওটাকে আক্রমণ করতে হবে।
নটিলাসকে জলের উপর ভাসিয়ে তোলার পর শুরু হল আক্রমণ।
বিশাল একটা শুঁড় অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় টেনে নিল একজন নাবিককে।
বাঁচাও! বাঁ-চা-ও!
হা ঈশ্বর!
আর একটা শুঁড় জড়িয়ে ধরলো নেডের পা -
পুচণ্ড ক্ষিপ্রতায় ক্যাপ্টেন নিমো কুড়ুলের এক কোপে কেটে ফেললেন শুঁড়টিকে
একদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলে নেড, সেই ঋণ আজ শোধ করলাম।
একঘন্টা তুমুল লড়াই চলার পর ছিন্নভিন্ন জীবটা নটিলাসকে ছেড়ে ডুব দিল গভীরে।
আমরা বাঁচলাম, কিন্তু আমাদেরই এক প্রিয় সাথী চিরকালের জন্যে চলে গেল।
SOUTAM
44

সূর্যের সৃষ্টি ও মৃত্যুর দিন

শচীনাথ মিত্র

জ্যোতির্বিদেরা মনে করেন যে এক বিশাল ধূম্রপুঞ্জের মেঘের ক্রমে ঘনীভবনের ফলে সূর্য ও তার পাশে গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। এই মেঘের সকল অংশ একভাবে ঘুরত না। এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মাত্রায় কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) গতি ছিল। কিছু অংশ জমে ক্রমে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, উল্কা ও ধূমকেতুর সৃষ্টি করে।

ক্রমে ঐ মেঘ বর্তুলাকার ধারণ করে। ভৌমাকর্ষণ শক্তি ক্রমে তাপ শক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে বস্তুপিণ্ডগুলিকে গলিয়ে ফেলে। সূর্যের মধ্যে এই শক্তি এত বেশী হয় যে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসগুলি সংযোজিত (fuse) হয়ে সৃষ্টি করে হিলিয়াম এবং প্রচুর উত্তাপ। এর ফলে তপ্ত গ্যাসের এক বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি হয় যা অন্তর্মুখী অভিকর্ষণের শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে। এই ঘটনা—সূর্যের সৃষ্টির 500 কোটি বৎসর আগে ঘটেছিল।

সূর্য এখন মধ্যবয়েসী।

বিজ্ঞানীদের ধারণা আজ থেকে আরও পাঁচ শত কোটি বছর পরে সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেনের জ্বালানী ঘাটতি পড়ে যাবে এবং এর থার্মোনিউক্লিয়ার (thermonuclear) বিক্রিয়া চলতে থাকবে সূর্যের কেন্দ্র থেকে এগিয়ে অগভীর বাইরের মণ্ডলে। সেখানেও হাইড্রোজেন দহন চলবে এবং সূর্যের বৃদ্ধি ঘটবে। তখন তার আয়তন দাঁড়াবে বর্তমান সূর্যের প্রায় 60 গুণ। আয়তন বাড়লে সূর্যের তাপ কমে যাবে এবং সূর্যের রং হবে গভীর লাল। তখন একে বলা যাবে 'লাল দৈত্য' (red giant) শ্রেণীর নক্ষত্র। বর্তমান সূর্যের 60 গুণ বড় এই টকটকে লাল সূর্য আকাশের অনেকটা জুড়ে থাকবে এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠের শেষ বিন্দু জল, হাওয়া শুষে টেনে নেবে এবং পার্থিব সকল প্রাণীর শেষ চিহ্নটুকু অবলুপ্ত হবে।

পৃথিবী তথা অন্য গ্রহগুলি এই রকম বায়ুমণ্ডলবিহীন অবস্থার পর সূর্যের জীবন কি ভাবে চলবে? নিজের পরিবারের মৃত্যুর শ্মশানের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবে এক হাজার কোটি বছরের বৃদ্ধ সূর্য। তার শরীরের মধ্যেকার অভিকর্ষণজনিত সংকোচন রোধ করার মত দহনশক্তি ভেতরে থাকবে না এবং ফলে এক সময়ে সূর্য আবার সংকুচিত হয়ে পৃথিবীর মত ছোট একটা 'সাদা বামুনে' (white dwarf)-এ পরিণত হবে। লাল সূর্য সাদা হবে এ কারণে যে লাল গ্যাস ও ধূলি ক্ষীয়মান অভিকর্ষণের টান উপেক্ষা করে বেরিয়ে যাবার সময় কেন্দ্রে সূর্যের আকর্ষণে সকল নিউক্লিয়াস জমা হবে এবং ভৌম- শক্তি আবার তাপশক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে সূর্য উজ্জ্বল সাদা বামুন শ্রেণীর ছোট তারকায় পরিণত হবে। এই সাদা বুড়ো বামুন সূর্যের ভর এত বেশী হবে যে এর এক ঘন সেন্টিমিটার পদার্থ কয়েক হাজার কিলোগ্রাম হবে।

এই অবস্থায় কয়েক শত কোটি বছর পরে সূর্য নিভে একেবারেই কালো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। আমাদের এই প্রিয় সূর্য নিভে গিয়ে আধারে ঢাকা পোড়া কালো বলের মত মহাশূন্যে ভাসতে থাকবে। গোটা সৌরমণ্ডলে বাতি জ্বালবার কেউ থাকবে না। চারিদিকে শুধু নিশ্ছিদ্র মহা মহা মহান্ধকার—তাতে নেই দিন, নেই রাত।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

মজার পাখি আলবাট্রস

পরেশ দত্ত

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বিখ্যাত পাখি আলবাট্রস। কোলরিজের বিখ্যাত কবিতা "অ্যানসেণ্ট মেরিনারে" (ancient mariner)বিষুব রেখার দক্ষিণ অঞ্চলে সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিক অ্যালবাট্রস পাখি হত্যা করে অভিশপ্ত হয়েছিল।

বাস্তবিক, দেবদূতের মতো নিরীহ, সুন্দর, শুভ্র, নিষ্পাপ আলবাট্রসকে হত্যা করার মাতো অপরাধ আর কিছু নেই। আলবাট্রসের মতো নিরীহ পাখিরা উত্তর মেরু অঞ্চলে বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারতো না। উত্তর মেরু অঞ্চলের মাঝে দক্ষিণ মেরুতে পোলার বিয়ার বা মেরু ভল্লুক, শৃগাল ও আদিম মানুষ থাকলে আলবাট্রস পাখি এতদিন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এরা অত্যন্ত অসতর্ক ও সরল। চির তুষারের রাজ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মরু দ্বীপ, সেই সব অঞ্চলে পাথরের মধ্যে ডিম পাড়ে এরা। কোন বাসা বাঁধে না। প্রতি এক বছর অন্তর অ্যালবাট্রস পাখি একটি মাত্র ডিম পাড়ে। ডিমে তা দেবার পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে, বাচ্চাকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রেখে অ্যালবাট্রস আবার আকাশে উড়ে যায়। বাচ্চার আর কোন খবরই রাখে না। ধারে কাছে অন্য কোন জন্তু জানোয়ার থাকলে আলবাট্রসের বাচ্চা কখনোই রক্ষা পেত না।

জন্মের এক বছর পর বাচ্চারা উড়তে শেখে। তারপর সেই যে আকাশে ডানা মেলে, ভাবতে অবাক লাগে যে একটানা নয় বছর সে আকাশে উড়ে থাকে। মুহূর্তের জন্য ও স্থলে নামে না। দীর্ঘ নয় বছর পর ডিম পাড়ার জন্য ফের মরু দ্বীপে বা শুষ্ক উপত্যকা অঞ্চলে নেমে আসে। নিউজিল্যাণ্ডের 2600 মাইল দক্ষিণে রস সমুদ্র অঞ্চলের মরু দ্বীপে আলবাট্রসের ডিম পাড়ার জায়গা।

আলবাট্রস পাখির গড়ন ও আকাশে ওড়ার নৈপুণ্য আশ্চর্যজনক। প্রায় সাড়ে এগারো ফুট ছড়ানো পাখার ওপর ভর করে আলবাট্রস্ চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে আকাশের নিচে নেমে আসে। ঘন নীল সমুদ্রের বুকে সুন্দরী আলবাট্রস তার বিশাল পাখা মেলে যখন তরঙ্গের ওপর দিয়ে উড়ে যায়—সেই শোভা বুঝি কোনো দিন ভোলা যায় না!

মেরু অঞ্চলে সারা বছরই প্রায় হ্যারিকেনের মতো বা তার চাইতেও তীব্র বেগে পশ্চিমা বাতাস বয়। আলবাট্রস্ পাখি তার বিশাল অথচ খুব হাল্কা ডানা বাতাসে ছড়িয়ে রাখে। খুব কম সময়েই তাকে ডানা নাড়তে দেখা যায়। এরা যেন বাতাসের মাছ। তাই বছরের পর বছর একটানা বাতাসে ভেসে থাকতে এদের কোনো কষ্ট নেই। বাতাসে ডানা মেলে রেখেই এরা ঘুমিয়ে নেয়।

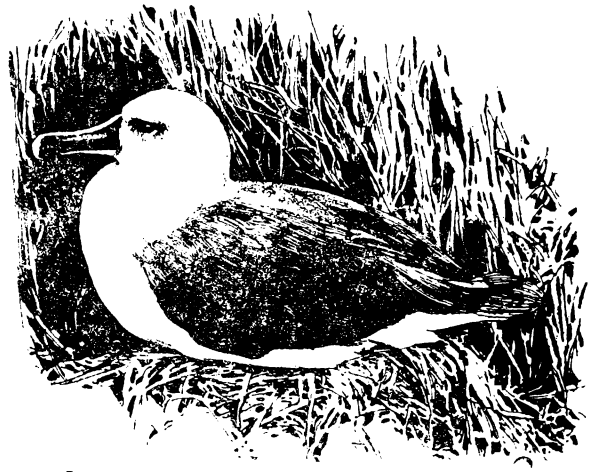

জীব বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জেনেছেন মেরু অঞ্চলের পাখিরা বুদ্ধিমান। মানুষের আগেই জানত পৃথিবী সমতল নয়, গোলাকার। কারণ পশ্চিমা বাতাসে মাসের পর মাস পুব দিকে ক্রমাগত উড়ে দীর্ঘকাল পর ডিম পাড়তে তারা ঠিক এক জায়গাতেই ফিরে আসে। পর্যবেক্ষণে আরও দেখা গেছে, মাত্র বাইশ দিনে আলবাট্রস 3,397 মাইল আকাশ পথ পরিক্রমা করতে পারে। যাযাবর পাখিদের মতো এদেরও পৃথিবীর চৌম্বকত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। নতুবা মরু অঞ্চলের ছয় মাস কাল ব্যাপী রাত্রির অন্ধকারেও প্রচণ্ড বাতাসে কখনই এরা সঠিক দিক নির্ণয় করতে পারত না।

সমুদ্রগামী জাহাজ দেখলেই আলবাট্রস্ তাকে দিন রাত্রি অনুসরণ করতে থাকে। জাহাজ থেকে ফেলে দেয়া আবর্জনা থেকে এরা খাদ্য সংগ্রহ করে।

আলবাট্রস সাধারণতঃ দক্ষিণ গোলার্ধের পাখি। তবে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ও আটলাণ্টিক মহাসাগর অঞ্চলে কখনো সখনো এদের দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ খাদ্যের সন্ধানে এরা উত্তর গোলার্ধে পাড়ি দেয়। 1963 সাল থেকে 1967 সালের মধ্যে বৃটেনের উপকূলে 13 বার আলবাট্রসের ঝাঁক দেখা গেছে।

আলবাট্রস পাখির বিভিন্ন গোত্র। ভ্রাম্যমান, রয়েল বা রাজকীয়, ওয়েভড্ (waved) কালো ঠ্যাঙওয়ালা, ল্যাজওয়ালা, লেসান্ (laysen) আলবাট্রস উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে দেখা যায়। এদের আদি পুরুষের বাস দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে। গ্যালা পাগস্ (gola pagas) দ্বীপে ডিম পাড়ে এরা। কালো ভ্রু ওয়ালা আলবাট্রসের সংখ্যাই সব চাইতে বেশি।

নানা প্রজাতির আলবাট্রস পাখি গ্রেট আলবাট্রসের ডানার পিছন দিকে কালো বর্ডার থাকে। আলবাট্রস পাখি চল্লিশ, পঞ্চাশ থেকে সত্তর আশি বছর পর্যন্ত বাঁচে।

4বি, শৈলেন্দ্র হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট কলি-26

ভূ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

সুনীতরায়

ভূ-বিজ্ঞান বিষয়টা অনেক পুরানো। কিন্তু, বিশ্লেষণ-মুখী দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বিজ্ঞানটির উন্নতি খুব একটা বেশী দিন হয় নি। তোমাদের যাদের বাড়ী পুরুলিয়া, বিহার, উড়িষ্যা কিম্বা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলায়, তারা হয়তো অনেকেই দেখেছ মাথায় টুপি, হাতে একটা হাতুড়ি আর একটা গোলাকৃতি চুম্বক নিয়ে পাথরের গায়ে কি সব খোঁড়াখুঁড়ি করছে, মাপছে আবার কখনো পাথর কুড়িয়ে ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখছে। এঁরা হলেন ভূ-বিজ্ঞানী। প্রকৃতির বুকের মধ্যে কত কিছু লুকিয়ে আছে যা আমরা সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারি না। কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে বলে দিতে পারেন কোথায় পেট্রোলিয়াম, কোথায় তামা, সোনা, লোহা আছে আবার সদা পরিবর্তনশীল পৃথিবীর গঠনগত বৈচিত্র্যের কারণও তাঁদের অজানা নয়।

আমাদের প্রিয় পৃথিবীর বয়স হল 450 কোটি বছর। এই পৃথিবী কিভাবে তৈরী হোলো, পৃথিবীর চারিত্রিক ও গঠনগত পরিবর্তনের পিছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে, তা নিয়ে গবেষণা বহুদিন ধরেই যে শুরু হয়েছে তা আগেই বলেছি। কঠোর যুক্তি আর সভ্যতার ওপর ভিত্তি করে যে দুজন বিজ্ঞানী ভূ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তাঁরা হলেন স্কটল্যাণ্ডবাসী জেমস্ হাট্টন্ ও স্যার চার্লস লিয়েল্। আজকে এই সুবৃহৎ বিজ্ঞানের বিষয়টি এই দুজন বিজ্ঞানীর মতবাদের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে আছে।

জেমস্ হাট্টন 1726 সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এডিন্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়তে যান। কিছুদিন ডাক্তারী পড়ার পর মনে হোলো, এটা তাঁর বিষয় নয়। তিনি ভাবলেন, ডাক্তারী আর পড়বেন না, মাঠে চাষ করবেন। পাকাপাকি ভাবে চাষ-আবাদ করাটাকেই যখন পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তখন তিনি এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন। তিনি মনে করলেন, পাথর থেকেই মাটির সৃষ্টি। তাই মাটির গুণাগুণ ভালোভাবে না জানলে উচ্চফলনশীল চাষ করা সম্ভব নয়। আবার মাটির উৎপত্তির ইতিহাস জানতে হলে বিভিন্ন ধরণের আর বিভিন্ন স্তরের পাথরের চারিত্রিক গুণাগুণ বের করতে হবে। পাথর অর্থাৎ যা দিয়ে ভূ-স্তর তৈরী হয়েছে তাদের সম্বন্ধে জানতে 24 বছর বয়সে আবার এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলেন।

সে সময়ে ভূবিজ্ঞানীরা জানতেন, পৃথিবীর ক্ষেত্রতলের আয়তন বহু বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। কিন্তু, কেন হচ্ছে, তার সঠিক উত্তর তাঁদের জানা ছিল না। অনেকে তলের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বলতেন, হঠাৎ কোনো পাহাড় সমুদ্রের তলায় ডুবে গিয়েছে কিম্বা সমুদ্রের জল সরে গিয়ে শুকনো ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু, হাট্টন এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, বাতাস, বৃষ্টি আর হিমবাহের প্রভাবে পৃথিবীর চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। স্থলভাগ ও জলভাগের আকৃতির পরিবর্তনই এই ঘটনার জন্যে দায়ী। এই পরিবর্তন খুব ধীরে বছরে এক মিটারেরও কম গতিতে শুরু হয়েছিল, আজো চলছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি একটা নদী স্থল-ভাগের মধ্যে দিয়ে দশ বছরে এক সেণ্টিমিটার করে প্রবাহিত হয় তাহলে দশ লক্ষ বছর পর তার থেকে আমরা 3000 ফুট একটা গভীর উপত্যকা পেতে পারি। এইভাবে নতুন আলোয় ভূ-বিজ্ঞানকে ভাবনা-চিন্তা করে তিনি বিভিন্ন বই ও বক্তৃতার মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে থাকেন। 1797 সালে এই মহামান্য বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

যে বছর হাট্টন মারা যান সেই বছরেই স্কটল্যাণ্ডের ফাংকুারশ্যায়ারের 26শে জুন ভোরে যে শিশুটির জন্ম হয়, তখন কেউই ভাবতে পারে নি এই শিশুই একদিন বিশ্ববিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক হবেন। ইনিই হলেন স্যার চার্লস লিয়েল। তিনি ভেবেছিলেন, একজন নামকরা ব্যারিস্টার হবেন। অক্সফোর্ডে আইন পড়তে ভর্তিও হন। কিন্তু, ছেলেবেলা থেকেই তিনি হাট্টনের বইগুলো পড়ে পড়ে মানসিক দিক থেকে একজন পরিণত ভূ-বিজ্ঞানী হয়ে যান। তাই আইনের বই পড়ার ফাঁকে বিভিন্ন ধরণের পাথর-নুড়ি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতেন। তিনিও পৃথিবীর চেহারা পরিবর্তনের স্বপক্ষে হাট্টনের যুক্তি মেনে নেন। জলস্ফীতির ফলে পৃথিবীর পরিবর্তন বাইবেলে নোয়া'র বন্যা হিসেবে উল্লেখ ছিল, তাই তৎকালীন পণ্ডিতেরাও সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই চার্লস লিয়েল নিজের মতবাদকে কষ্টিপাথরে যাচাই করার জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে অভিযান চালিয়ে প্রমান সাপেক্ষের মতো পাথর সংগ্রহ করেন। তিনি প্রমাণ করেন পাথর কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে বৃষ্টি ও হিমবাহের ফলে পাল্টে যায়। নদীগুলো কিভাবে পাথর বয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে আবার সেগুলো কিভাবে মহাসাগরের বুকে জমা হয়ে চড়ার সৃষ্টি করে, তাই তিনি হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দেন। নদী স্থলভাগকে খাইয়ে দিয়ে কিভাবে সুউচ্চ উপত্যকা

তৈরী করে তাও তিনি দেখান। এভাবে প্রাচীন পৃথিবীর চেহারা কেমন ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। 1830 সালে লিয়েল ভূ-বিজ্ঞানের অতি মূল্যবান গ্রন্থ 'প্রিন্সিপলস্ অফ জিওলজি' প্রকাশ করেন। তখন পণ্ডিতেরা সমালোচনা করে বলেন, লিয়েল নতুন কিছু বলেন নি বা লেখেন নি—এসবই হাটন-এর কাজ। জীবিতাবস্থায় এই গ্রন্থটি কোনো মূল্যই পায় নি। পরে এটা পাঠ্য বই-এর সম্মান পায় ও সমস্ত মতবাদই সত্য বলে স্বীকৃত হয়।

হাটন-এর মতো লিয়েল খুব সাদাসিধে খোলামেলা মনের লোক ছিলেন। 1848 সালে রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। চার্লস ডারউইন, আলফ্রেড রাসেল প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিরা তাঁর কাজে উৎসাহ যোগাতেন। 1875 সালে এই বিজ্ঞানীর যখন মৃত্যু হয় তখন চার্লস ডারউইন বলেছিলেন, বর্তমানে এই বিজ্ঞানী স্বীকৃতি না পেলেও পরবর্তীকালের মানুষ ও ভূ-বিজ্ঞান চিরকাল তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

আর, কে, হল সি—218, আই, আই, টি, খড়্গপুর-721 302

ধাতুর দৌড়ে প্রথম 87 নম্বর মৌল

কমল চক্রবর্তী

মাদাম কুরির নাম আমরা শুনেছি। না শোনার কথা নয়। ইনিই সেই মহিলা বিজ্ঞানী যিনি দু-দুবার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন এবং থাকবেন দুটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের জন্য। মৌলিক পদার্থ দুটি হল দুটি তেজস্ক্রিয় ধাতু—পোলোনিয়াম আর রেডিয়াম। ম্যাণ্ডেলিয়েভ সারণীর দুটি ঘর তিনি পূরণ করলেন তাঁর এই আবিষ্কারের মাধ্যমে। ঘর দুটি হল যথাক্রমে 84 এবং 88। মাদাম কুরির পর আর এক মহিলা বিজ্ঞানী ম্যাণ্ডেলিয়েভ সারনীর একটি ঘর (75 নম্বর) পূরণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম ইডা নডাক।

এ পর্যন্ত বহু মৌলই আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু 86 আর 88 নম্বরের মাঝামাঝি মৌলটির আবিষ্কার খুব সহজে হয় নি। তখনকার এই আবিষ্কৃত মৌলটি যে একদিন বিক্রিয়ার দৌড়ে প্রথম হবে কে জানত? আর একে খুঁজে বার করতে যথেষ্ট হিমসিম খেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। এই 87 নম্বর মৌলটির নাম তখন দেওয়া হয়েছিল একা-সিজিয়াম। 1930 সালে অ্যালিসন এবং তাঁর সহকর্মীরা কয়েকটি খনিজে এই মৌলের উপস্থিতি ঘোষণা করেন। এই খনিজগুলি হচ্ছে পলুসাইট, লেপিডোলাইট প্রভৃতি। মার্কিন পদার্থবিদ্ অ্যালিসনের এই আবিষ্কার বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি মৌলটির নাম দিয়েছিলেন ভার্জিনিয়াম। এক অলীক কল্পনা। সুতরাং একাসিজিয়াম এই ধাতুটি রহস্যের মধ্যেই থেকে গেল।

এর পরের বছর অর্থাৎ 1931 সালে প্যাপিস নামে এক গবেষক স্যামারসকাইট নিয়ে এক্স-রে পরীক্ষা করার সময় এই মৌলের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। এর কয়েক বছর পর অর্থাৎ 1939 সালে মার্গারেট পেরে এই মৌলটি প্রস্তুত করতে সক্ষম হন অ্যাকটেনিয়াম থেকে। পেরে ছিলেন তখন কুরি গবেষণাগারের এক গবেষক। তিনি দেখলেন, অ্যাকটেনিয়াম যখন আলফা রশ্মি বিকিরণ করে তখন ফ্রান্সিয়াম সৃষ্টি হয়। এর পরমাণুর মাত্র 1 শতাংশ আলফা রশ্মিতে ভাঙ্গে। সে সময় এর নাম ছিল অ্যাকাটিনিয়াম-K এবং পরে ফ্রান্সের নামানুসারে এর নাম হয় ফ্রানসিয়াম। নামকরণ করেন পেরে স্বয়ং। এই ধাতুটি পাওয়া যায় তেজস্ক্রিয় অ্যাকটিজিয়াম থেকে আর অ্যাকটিনিয়ামের সম্মান রাখার জন্য ধাতুটি নিজেও থাকে তেজস্ক্রিয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতি রশ্মি বিকিরণ করতে পারে। 87 নম্বর মৌল ফ্রান্সিয়াম বিটারশ্মি বিকিরণ করতে পারে কিন্তু এই মৌলটির আয়ু খুবই কম। এর অর্দ্ধজীবন মাত্র 22 মিনিট।

এই ধাতুটি হচ্ছে ধাতুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সক্রিয়, যেমন ফ্লোরিন হচ্ছে অধাতুর মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয়। ক্ষার ধাতুগুলির মধ্যে আবার এটি সবথেকে ভারী অথচ কি দুঃখের কথা এর জীবনশক্তি বা অর্দ্ধজীবন রেডিয়াম, রেডন বা অ্যাক্টিনিয়ামের চেয়েও কম। তবে এর ধর্ম পর্যায়সারণীর গ্রুপ-১ মৌলদের মতই, সে ব্যাপারে কোন গরমিল নেই। এর অল্পআয়ুর জন্য এটিকে সঞ্চয় করা যায় না। পারদ ছাড়া এই ধাতুটিই সব থেকে কম উষ্ণতায় গলে। ঘরের উষ্ণতায় এটিকে রাখতে পারলে এটি তরলের মত দেখাত এবং তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গনের ফলে জলের মতো ফুটত।

এখন ধাতুগুলির মধ্যে বিক্রিয়ার দৌড়ে এর প্রথম হওয়ার কারণটি কি জানা যাক। এটি একটি ক্ষার ধাতু। ক্ষার ধাতু এমনিতেই খুব সক্রিয়। ক্ষার ধাতুগুলির মধ্যে এর পারমাণবিক ব্যাসার্দ্ধ—সবচেয়ে বেশী এবং তাই সহজেই সে তার বাইরের খোলের একমাত্র ইলেকট্রনকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত। আর এই গুণের জন্য সে রাসায়নিক তৎপরতায় ধাতুগুলির মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা

স্পিরিট

অমরনাথ রায়

সকালবেলা প্রাইমাস স্টোভে চায়ের জল ফোটানো হবে। স্টোভ ধরানো হবে কি দিয়ে?—স্পিরিট দিয়ে। মাঝরাতে ছোট্ট খোকা রোজ কাঁদে। বোধ হয় ক্ষিদে পাওয়ার জন্য ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। মা তখন ওকে দুধ গরম করে খাওয়ান। কিন্তু অত রাতে সামান্য একটু দুধ গরম করবার জন্যে স্টোভ জ্বালানোর হাঙ্গামা পোয়াবে কে? বাড়ীতে বিজলী বাতি নেই, যে হিটার ব্যবহার করা হবে। নেই থার্মোফ্লাস্কও। মা তাই ঘরে রাখেন একটা স্পিরিট ল্যাম্প। নাম শুনেই বুঝতে পারছ—স্পিরিটে-এ ল্যাম্প জ্বলে।

বাড়ীতে কাঠের নতুন আসবাবপত্র তৈরি হয়েছে। সেগুলিতে বার্ণিশ না লাগালে দেখতে ভাল লাগবে না। এই বার্ণিশ তৈরি করতেও লাগে স্পিরিট। নামটা আসলে 'মেথিলেটেড স্পিরিট'। বড় নামটাকে উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমরা ছোট করে নিয়েছি—'স্পিরিট'।

এই স্পিরিট জিনিসটা একটা জৈব রাসায়নিক দ্রব্য। এটা তৈরী হয় ইথাইল অ্যালকোহল বা সুরাসার থেকে। 'অ্যালকোহল' বলতে আমরা সাধারণতঃ ইথাইল অ্যালকোহলকেই বুঝি। ইথাইল অ্যালকোহল তৈরী করা যায় গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা শর্করা থেকে, ইক্ষু শর্করা বা চিনি থেকে, এবং ঝোলা গুড় থেকে। এ ভিন্ন আলু, ভুট্টা, চাল ইত্যাদি পদার্থে যে শ্বেতসার বা স্টার্চ থাকে, তার থেকেও ইথাইল অ্যালকোহল তৈরী করা যায়।

ইথাইল অ্যালকোহল মদ রূপে পাণীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে এর উপর বেশী করে আবগারী কর (Excise Duty) ধার্য করা হয় সরকার থেকে। কিন্তু শিল্পে ইথাইল অ্যালকোহলের প্রচুর ব্যবহার আছে। শিল্পে ব্যবহারের জন্যে ইথাইল অ্যালকোহল যাতে সস্তায় পাওয়া যায় তার জন্যে একে পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে ইথাইল অ্যালকোহলের সঙ্গে নানা ধরণের বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ মেশানো হয়। এই সব পদার্থের মধ্যে মিথাইল অ্যালকোহল বা উড্ স্পিরিট, ন্যাপথা, পিরিডিন ও রবার—নির্যাস অন্যতম। এইভাবে যে অ্যালকোহল তৈরী করা হয়, তার নাম 'ডিনেচারড্ স্পিরিট' যদি ইথাইল অ্যালকোহলে মিথাইল অ্যালকোহল 10% বা তার বেশি মেশানো হয়, তবে তাকে আমরা বলি 'মেথিলেটেড স্পিরিট'। মেথিলেটেড স্পিরিট বিষাক্ত বলে পানের অযোগ্য। পান করলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে বলে মেথিলেটেড স্পিরিটের বোতলের গায়ে মড়ার মাথার ছাপ মারা কাগজ আটকানো থাকে।

95·6% ইথাইল অ্যালকোহল এবং 4.4% জলের মিশ্রণের একটি মজাদার ধর্ম আছে। এই মিশ্রণ স্থির স্ফুটনাংক (78. 15°c) বিশিষ্ট তরল পদার্থ বলে এ থেকে আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় জল দূর করা যায় না। একে বলা হয় শোধিত অ্যালকোহল বা রেকটিফায়েড স্পিরিট। শিল্পে এবং ল্যাবরেটরীতে নানান্ কাজে রেকটিফায়েড স্পিরিট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

এ ভিন্ন আর এক রকমের স্পিরিট আছে। তার নাম 'প্রুফ স্পিরিট'। যদি ইথাইল অ্যালকোহল দ্রবণে ভরের অনুপাত হিসাবে 49.3% কিংবা আয়তনের অনুপাত হিসাবে 57% ইথাইল অ্যালকোহল থাকে, তবে তাকে 'প্রুফ স্পিরিট' বলা হয়। যদি দ্রবণে ইথাইল অ্যালকোহলের পরিমাণ এর চেয়ে বেশী থাকে, তবে তাকে বলা হয় 'ওভার প্রুফ স্পিরিট' আর কম থাকলে বলা হয় 'আণ্ডার প্রুফ' স্পিরিট'।

একটা মজার কথা জেনে রাখ। জল ও ইথাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে মিশ্রণকে বারুদের উপর ঢেলে দিলে, বারুদে আগুণ জ্বলে উঠে। অ্যালকোহল জ্বলে যাবার পর যদি বারুদে আগুন লাগে, তবে বুঝবে যে মিশ্রণটি 'প্রুফ-স্পিরিট'। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ভর অনুযায়ী 'ঐ মিশ্রণে অ্যালকোহলের অনুপাত 49·3% এর কম হলে অ্যালকোহল জ্বলে যাবার পর বারুদে আর আগুন লাগে না।

বিশ্বাস না হয় তো পরীক্ষা করেই দেখ না কেন।—এখন বল, এতো রকম স্পিরিটের কথা কি তোমরা আগে জানতে?

এন. বি. টি- 99A, নিউট্রাকিক, খড়্গপুর।

মনের অসুখ

সুজিত মুখোপাধ্যায়

ডাক্তারের আশ্বাসবাণীতেও অনেক সময় আমাদের স্থির থাকতে দেয় না। ক্লান্তিবোধ, বুকধড়ফড়, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, অবসন্নতা, ঝিমুনিভাব—নিত্য অভিজ্ঞতা, অথচ এদিকে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন ঠিক, স্টেথিস্‌কোপে বুকে পিঠে সুস্থতার নির্দেশ এবং রোগের অন্য উপসর্গ অর্থাৎ Symptom-এরও অভাব। ফলে ডাক্তারের সুস্পষ্ট অভিমতও কাল্পনিক রোগীকে নিরুৎসাহ করে। আর নিরুৎসাহ তো করবেই কারণ রোগ তো শরীরে নেই—রোগ মনে। মনের অসুখ Anxiety neurosis, এ অসুখ তো স্টেথিসকোপে ধরা পড়ার নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে যদি একশ জনের উপর পরীক্ষা চালান যায় তাহলে দেখানো যাবে যে প্রায় চারজন মানুষ আছেন যারা এই রোগে আক্রান্ত। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে যতই সভ্যতার বিকাশ এবং শিল্পের উন্নতি অর্থাৎ জল, বায়ু, মাটি যতই Poluted হচ্ছে ততই এই অসুখের বিস্তার ঘটছে। শহরের কৃত্রিম জীবন-যাত্রা এবং জীবনধারনের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এই Anxiety neurosisও সমানুপাতে বাড়ছে। সমাজে পুরুষ এবং নারী সকলের মধ্যেই এই রোগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মেয়েরা বরং ছেলেদের তুলনায় Anxiety neurosis রোগে বেশি আক্রান্ত হন। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যেখানে পুরুষের সংখ্যা এক, সেখানে সচরাচর দুজন নারী আছেন যারা এই রোগে আক্রান্ত।

মনের এই অসুখ বংশগত—একথা ঠিক নয়। সংসর্গ নিশ্চয় এই রোগের বিস্তার ঘটায় অর্থাৎ Vector হিসাবে কাজ করে। যে বাড়ীতে পিতামাতার একজন এই রোগে ভুগছেন তাদের ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আর পিতা মাতার দুজনেরই যদি Anxiety neurosis থাকে তাহলে চারিটি ছেলেমেয়ের কয়জনেরই এই রোগে পড়বার আশঙ্কা। কারণটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, সংসর্গই এক্ষেত্রে দায়ী।

মনের এই অসুখের কারণ কি? বিজ্ঞানীরা রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে এই অস্বাভাবিক অবস্থার একটা জবাব খুঁজে পেয়েছেন। এই জবাবের মূল উপাদান ল্যাকটিক অ্যাসিড। যে ব্যক্তির দেহের রক্তে ল্যাকটিক অ্যাসিডের উপাদানগত পরিমান বেশী, তারই মানসিক দুশ্চিন্তার শিকার হবার আশঙ্কা।

দৈহিক শ্রমের সময় আমাদের দেহে গ্লুকোজের রূপান্তর ঘটে। শক্তি উৎপাদনে এ এক অপরিহার্য্য প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার শেষ লগ্নে ল্যাকটিক অ্যাসিডের উৎপত্তি। এর কিছুটা অংশ পরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং জলে (H_2O) পরিণত হয়। কিন্তু অধিকাংশই রক্তে সংমিশ্রণ ঘটে এবং যকৃতে তা আবার গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। ফলে ল্যাকটিক অ্যাসিডে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। কিন্তু মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে রক্তে এই উপাদানটির পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই যেখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড সংক্রান্ত উপাদানের বৃদ্ধি ঘটে, সেখানেই মনের দিক থেকে সুস্থ মানুষেরও বুক ধড়ফড়, অবসন্নতা এবং ক্লান্তির অনুভূতি।

99, মহারাজা নন্দকুমার রোড (নর্থ), আলমবাজার, কলি-35।

রঙবেরঙের বাঘ

বিশ্বনাথ বসু

আজকাল বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সাদা বাঘ নিয়ে যথেষ্ঠ আলোচনা হচ্ছে, এবং সাধারণ চিড়িয়াখানা ভ্রমনার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে কৌতুহলও কম নয়। বাঘের চেহারা বা গায়ের রঙের ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার যথেষ্টই প্রভাব আছে, এবং সে কারণে অঞ্চলভেদে বাঘেদের গায়ের রঙ সাদা বা কালো হওয়াটা ঐ একই কারণে নয়। শরীরের স্বাভাবিক রঙের এই রূপান্তর নিশ্চিতই শরীরের ভেতরকার কোন জৈবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত।

আজ পর্যন্ত যতটা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে প্রমানিত হয় যে প্রধানত পূর্বতন রেওয়া রাজ এস্টেট ও মধ্য-প্রদেশের তৎসংলগ্ন জেলাগুলির অরণ্যাঞ্চল হচ্ছে সাদা বাঘের উৎপত্তিস্থল—যদিও ভারতের আরো কোন কোন এলাকায়ও যে সাদা বাঘের অস্তিত্ব ছিল এরূপ তথ্যও অতীতে পাওয়া গেছে।

জানা যায় ইংরেজী 1920 সালে ভারত থেকে একটি জীবিত সাদা বাঘ ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে জনসাধারণকে দেখানো হয়েছিল। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মেজর ডি, রবিনসন নামে এক বিদেশী ভদ্রলোক পূণায় পূর্ণ বয়স্ক একটি সাদা বাঘ পেয়েছিলেন। সমসাময়িক কালে তৃতীয় একটি সাদা বাঘের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছিল কর্নেল এইচ, এইচ, গডউইন অস্টেন নামক বন-পাগল এক সামরিক অফিসারের দ্বারা। 1908 সালে কুচবিহারের তৎকালিন মহারাজা একটি সাদা বাঘের বাচ্চা শিকার করেছিলেন। 1938 সালের শীতকালে বিশ্ববিখ্যাত শিকারী জিম করবেট কুমায়ুনের জঙ্গলে বহু চেষ্টা করে ছয়টি বাঘের মুভি ফিল্ম তুলতে সমর্থ হন যার মধ্যে দু'টি ছিল বাঘিনী। ঐ দু'টির মধ্যে একটি ছিল আবার সাদা রঙের পূর্ণ বয়স্কা বাঘিনী।

অনেকে 'অ্যালবিনো'—অর্থাৎ ধবল রোগগ্রস্ত বাঘকে সাদা বাঘ বলে ভূল করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার প্রকৃত অ্যালবিনো-বাঘের গায়ে ডোরাকাটা দাগ একেবারেই মিলিয়ে যায়। না গেলেও খুবই অস্পষ্ট, এবং তাদের চোখের মনি নীল। অ্যালবিনো-বাঘ সচরাচর চোখে পড়েনা। বহু বছর আগে একটি পূর্ণ বয়স্ক অ্যালবিনো বাঘ শিকারের খবর পাওয়া গিয়েছিল আসামের জঙ্গলে। বহু লোক সেটিকে দেখতে ভীড় জমিয়েছিল। 1922 সালে কুচবিহারে দুইটি অ্যালবিনো ব্যাঘ্র-শিশুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে মার্কিন মুল্লুকে হাইথর্ন সার্কাস করপো-রেশনের হেফাজতে একটি ব্রাউন ডোরাদাগযুক্ত সাদা বাঘিনী আছে যেটিকে এক ধরনের ধবল রোগগ্রস্ত বলে অনুমিত হয়। এটি একটি স্বাভাবিক রঙের বাংলার বাঘিনীর গর্ভজাত।

1951 সালে মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার জঙ্গলে একটি বাঘিনীকে তিনটি বাচ্চা নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়। তার মধ্যে একটি ছিল সাদা বাচ্চা। জঙ্গল দেখিয়ে সাদাটিকে ধরা হয়। অন্য দুটি গুলিতে নিহত হয়। কিন্তু সাদা

বাচ্চাটি এক ফাঁকে পালিয়ে গিয়ে আবার ধরা পড়ে। এবার তাকে রেওয়ার মহারাজার গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়। এটি ছিল পুরুষ বাচ্চা। মহারাজা আদর করে তার নাম দেন 'মোহন'। রাজকীয় আদর যত্নে মোহনের বয়স বাড়তে থাকে, এবং ধীরে ধীরে সে গায়ে গতরে বেশ তাগড়াই হয়ে ওঠে। তখন রেওয়ার মহারাজা মোহনের দ্বারা সাদা বাঘের বংশবৃদ্ধি ঘটাবার একটি পরিকল্পনা করেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে 'বেগম' নাম্নী স্বাভাবিক রঙের একটি বাঘিনীকে মোহনের সঙ্গিনী হিসেবে তার খাঁচায় ছেড়ে দেন। মোহনের সঙ্গে বেগমের বেশ ভাব সাব হয় এবং তাদের বাচ্চা হতে সুরু করে। এই ভাবেই উক্ত প্রকল্পের সূত্রপাত, এবং পরবর্ত্তী কালে তা বিরাট সাফল্য লাভ করে। যেহেতু শিশু অবস্থায় সাদা মোহনকে জঙ্গল থেকে ধরা হয়েছিল, সেই হেতু তার জন্ম বৃত্তান্ত জানা সম্ভব হয়নি। কাজেই মোহনকেই শ্বেত ব্যাঘ্র-বংশের আদি পুরুষ বলা যেতে পারে। মোহনকে ধরা হয় 1951 সালে, এবং বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় যতটা বোঝা যায় তাতে মনে হয় জঙ্গলে তার জন্ম হয়েছিল 1950 সালের আগস্ট মাসে। মৃত্যু হয় তার 1970 সালের ডিসেম্বর মাসে—অর্থাৎ প্রায় 19 বছর 5 মাস সে বেঁচে ছিল। আদি পূর্বপুরুষ হিসেবে মোহন যে বংশের পত্তন করে গিয়েছে, বলা বাহুল্য তার প্রতিটি সভ্য সভ্যা স্বভাবতই চিড়িয়াখানার বন্দী-নিবাসে জন্মেছে। এই বংশধরদের মোট সংখ্যা 1979 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল 226 যার মধ্যে 120 টি সাদা ও 106 টি স্বাভাবিক রঙের বাঘ। উপরোক্ত 120 টি সাদা বাঘের মাত্র 40 টি জীবিতাবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় এখনও বন্দী আছে।

বাঘের গায়ের স্বাভাবিক রঙের রূপান্তরের অন্তর্নিহিত জৈবিক কারণটা বেশ জটিল। পশু-বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন—বংশানুগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক হচ্ছে 'জীন' নামক একটি জৈবিক উপাদান। সমধর্মী ও ভিন্নধর্মী দুই প্রকারের 'জীন'—এর অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়ার প্রচ্ছন্ন প্রভাবে পশুদেহে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রঙের বিবর্ত্তন ঘটার সম্ভাবনা আছে যদিও সেই বিবর্ত্তনের ফলাফল সব সময় যে নিখুঁতভাবে তাত্ত্বিক ফর্মুলা অনুযায়ী প্রকাশ পাবে এমন নিশ্চিত প্রত্যাশা করাও চলে না। সাদা বাঘের আবির্ভাব জন-মানসে যেন একটি বিস্ময়কর ঘটনারূপে প্রতিভাত হচ্ছে। তাই তার বিবরণটা আলোচ্য ক্ষেত্রে সংক্ষেপে যতটা বেশি তথ্য-সমৃদ্ধ করা যায় সেই চেষ্টাই করলাম।

কিন্তু কুচকুচে কালো রঙের বাঘের অস্তিত্বের ঘটনা বিরল হলেও একেবারে অবাস্তব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিঃ সি. টি. বাকল্যাণ্ড নামক এক ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্ত্তী চট্টগ্রাম জেলার এক স্থানে সম্পূর্ণ কালো রঙের একটি মৃত বাঘের কথা জানা যায়। অতীতে ব্র্যাণ্ডার কার্টার একবার খবর দিয়েছিলেন যে তৎকালীন সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের জঙ্গলে কালো রঙের একটি বাঘ পাওয়া গেছে। ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ ব্রহ্মদেশেও এক সময় কালো বাঘের অস্তিত্ব ছিল। আরো ছিল চীন দেশের দক্ষিণাঞ্চলে 'ব্ল্যাক ড়োভিল' নামে পরিচিত নীল রঙের বাঘ।

জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের লিপজিগ চিড়িয়াখানার কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রণীত ইণ্টারন্যাশনাল টাইগার স্টাডবুকের (তথ্যগ্রন্থ) মাধ্যমে খবর পাওয়া গেছে যে আমেরিকার ওয়াশিংটন চিড়িয়াখানায় রেওয়ার শ্বেত ব্যাঘ্র-বংশের সঙ্গে জন্মসূত্রে সম্পর্কযুক্ত 'কেশরী' নাম্নী এক বাঘিনীর গর্ভে 1974 সালের জুন মাসে এবং 1976 সালের জুলাই মাসে দুইটি কমলা রঙের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে—প্রাকৃতিক বৈচিত্রের মধ্যে বাঘেরও একটি লক্ষনীয় ভূমিকা আছে।

21ই হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-700 003

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

"মিস্টার ওয়াটসন কাম হিয়ার। আই ওয়াণ্ট ইউ।" U. S. A.-র বস্টন শহরে একটা বোর্ডিং বাড়ির চিলেকোঠা থেকে এই বার্তা নীচের হল ঘরে পৌঁছলে মিঃ ওয়াটসন আনন্দে উত্তেজনায় কোন রকমে বললেন, "মিঃ বেল, আমি আপনার কথা স্পষ্ট শুনেছি।" ১৮৭৬ সালে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল সর্বপ্রথম টেলিফোন আবিষ্কার করে ঐ কথা বলেন।

—সর্বেন্দু সিংহ রায়, হরিপাল, হুগলী

মসকালিনাইট

সঙ্কর্ষণ রায়

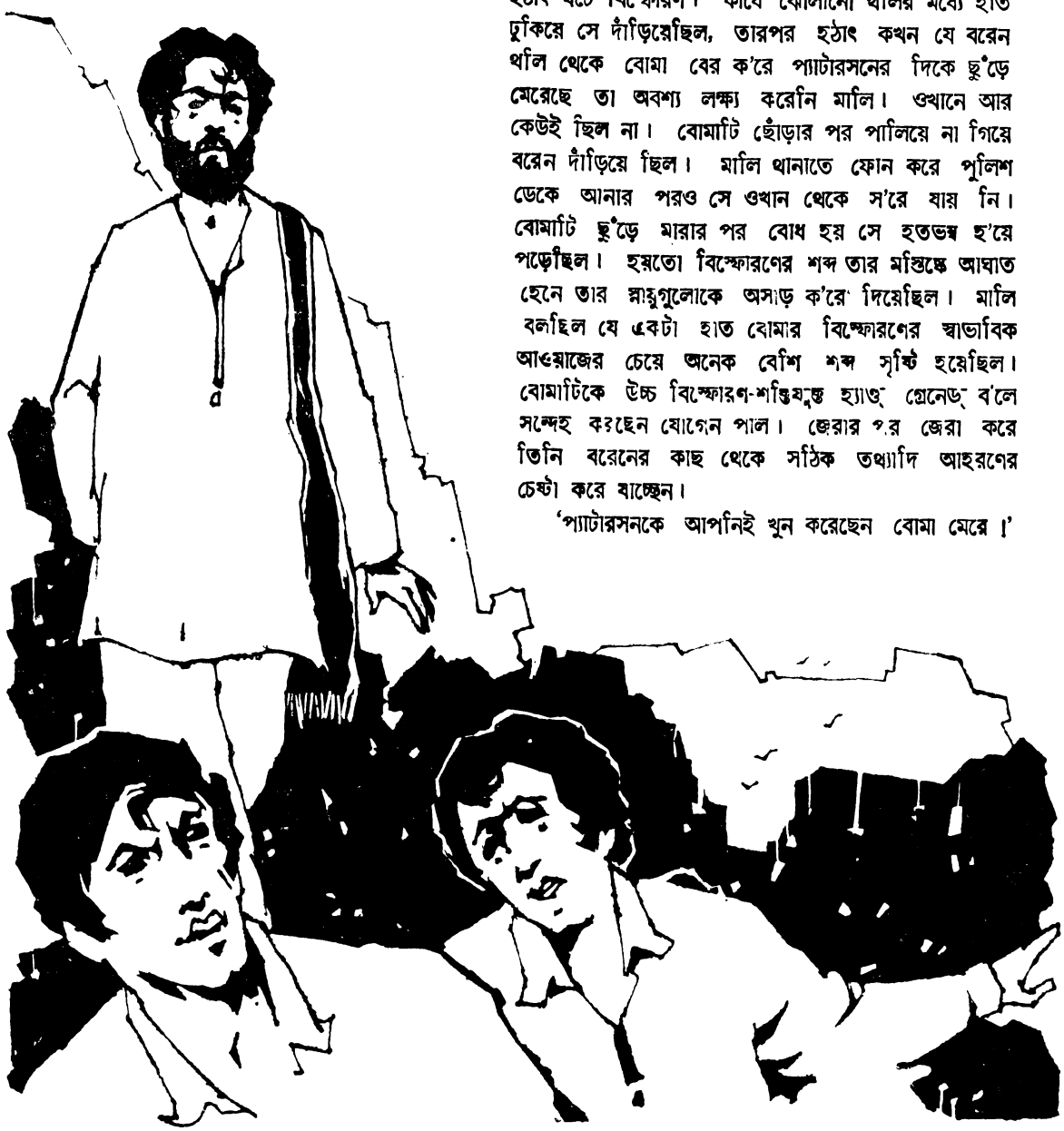

'আপনিই খুনী?'

বরেনের মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে প্রশ্ন করেন পুলিশ ইনস্পেক্টর যোগেন পাল।

স্থান ম্যাকলাস্কিগঞ্জের থানা। রাত তখন দুটো। বরেন সামন্তকে গ্রেপ্তার ক'রে আনা হয়েছে প্যাটারসন-সাহেবের বাংলো থেকে। বাংলোর সামনে গ্র্যানিট পাথরের টিলার ওপরে বরেন নাকি প্যাটারসনের ওপরে বোমা ছুঁড়ে মেরে তাঁকে হত্যা করেছে। প্যাটারসনের মালি নিজের চোখে বরেনকে একটি পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঘটে বিস্ফোরণ। কাঁধে ঝোলানো থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল, তারপর হঠাৎ কখন যে বরেন থলি থেকে বোমা বের ক'রে প্যাটারসনের দিকে ছুঁড়ে মেরেছে তা অবশ্য লক্ষ্য করেনি মালি। ওখানে আর কেউই ছিল না। বোমাটি ছোঁড়ার পর পালিয়ে না গিয়ে বরেন দাঁড়িয়ে ছিল। মালি থানাতে ফোন করে পুলিশ ডেকে আনার পরও সে ওখান থেকে স'রে যায় নি। বোমাটি ছুঁড়ে মারার পর বোধ হয় সে হতভম্ব হ'য়ে পড়েছিল। হয়তো বিস্ফোরণের শব্দ তার মস্তিষ্কে আঘাত হেনে তার স্নায়ুগুলোকে অসাড় ক'রে দিয়েছিল। মালি বলছিল যে একটা হাত বোমার বিস্ফোরণের স্বাভাবিক আওয়াজের চেয়ে অনেক বেশি শব্দ সৃষ্টি হয়েছিল। বোমাটিকে উচ্চ বিস্ফোরণ-শক্তিযুক্ত হ্যাণ্ড্ গ্রেনেড্ ব'লে সন্দেহ করছেন যোগেন পাল। জেরার পর জেরা করে তিনি বরেনের কাছ থেকে সঠিক তথ্যাদি আহরণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

'প্যাটারসনকে আপনিই খুন করেছেন বোমা মেরে!'

যোগেন পাল বললেন, 'আপনার কাঁধে ঝোলানো থলি থেকে বোমা বের করে ..'

'আমার থলিতে বোমা ছিল না।' বরেন বাধা দিয়ে বললে, 'ওতে আমার কাগজপত্র, ছবি আঁকার সরঞ্জাম আছে.. এই দেখুন...'

'আপনি বলতে চান যে প্যাটারসনকে লক্ষ্য করে আপনি বোমা ছোঁড়েন নি?'

'না।'

'তা হ'লে বোমাটা ছুঁড়ল কে?'

'তা তো জানি না।'

'পিটার প্যাটারসন নৈশ-ভোজের পর তাঁর বাংলো থেকে বেরিয়ে ঐ টিলার ওপরে যখন পায়চারি করছিলেন, ওখানে তখন আপনি ছাড়া আর কেউই ছিল না। প্যাটারসনের মালি কাছাকাছি থাকলেও তাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না আমি, কারণ সে প্যাটারসনের খুবই পুরোনো বিশ্বাসী লোক, সে প্যাটারসনকে খুন করবে এ কখনো হতেই পারে না।'

'না প্যাটারসনকে সে খুন করে নি'.. আমি যে করি নি তা তো আগেই বলেছি...'

'তা হ'লে কে খুন করল প্যাটারসনকে?' যোগেন পাল উত্তেজিত হয়ে ওঠেন: 'ওখানে তৃতীয় কোন লোক ছিল ব'লে তো কোন প্রমাণ পাই নি।'

'না, আর কেউই ছিল না ওখানে।' বরেন গম্ভীর মুখে বললে, কিন্তু আমি খুন করি নি।'

'ব্যাপারটা রীতিমত ভৌতিক ব'লে মনে হচ্ছে। আচ্ছা বরেনবাবু, অত রাত্রে আপনি ওখানে গিয়েছিলেন কেন?'

'প্যাটারসন আমাকে যেতে বলেছিলেন বলেই গিয়েছিলাম। তাঁর ইচ্ছে ছিল, জ্যোৎস্না রাতে ঐ টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। আপনারা জানেন কিনা জানি না, তিনি একজন সুকবি ছিলেন...তিনি কবি, আমি শিল্পী...আমাদের দুজনের মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ..'

'প্যাটারসন আবৃত্তি শুরু করার আগেই বোধ হয় আপনার বোমার বিস্ফোরণ ঘটল—তাই না?'

'আমার নয়, অন্য কারুর বোমার বিস্ফোরণ হল। সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেলেন আমার কবি...'

বলতে বলতে বরেনের গলার স্বর অবরুদ্ধ হ'য়ে আসে।

'আপনার কবিকে আপনিই নীরব ক'রেছিলেন!' ঝাঁজালো স্বরে বললেন যোগেন পাল।

'না না, আমি নই। কতবার বলব হত্যাকারী আমি

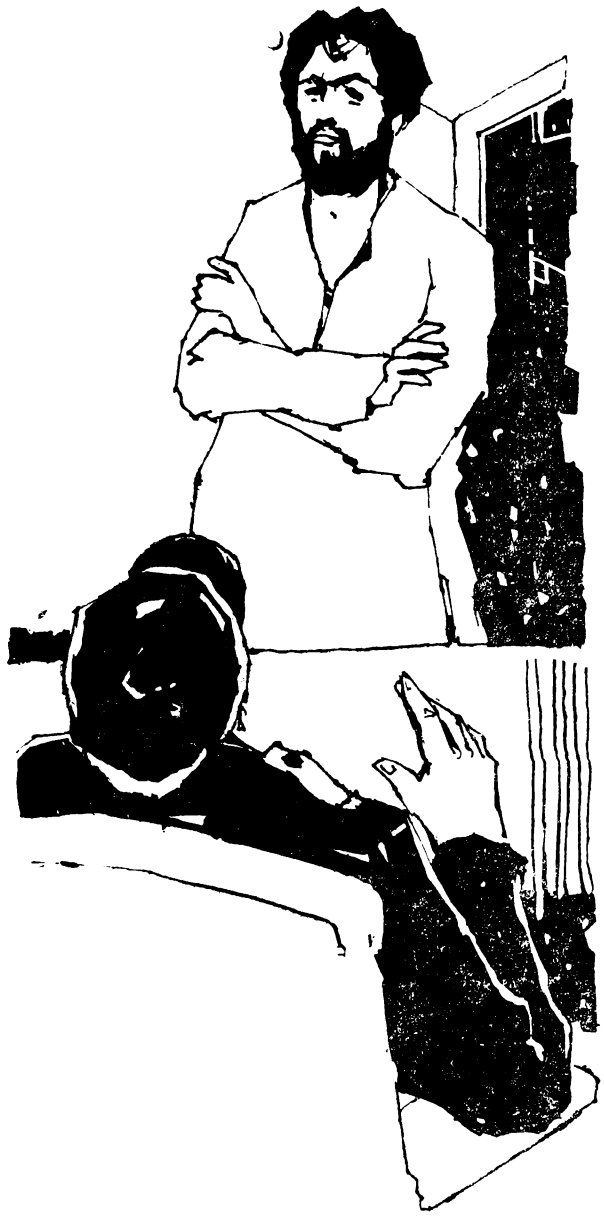

কিন্তু আমি খুন করিনি।

নই, আর কেউ। খুঁজে বের করুন তাকে। অকুস্থলে *গিয়ে সন্ধান নিন, পেয়ে যেতে পারেন আসল হত্যাকারীর হদিস।*'

এমন সময় ঘরে ঢুকল দুজন পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যুবক। যোগেনের কাছে এসে তারা নিজেদের পরিচয় দিল। একজনের নাম সৌরভ বসু। পেশায় জিয়োলজিস্ট।

প্যাটারসনের বাংলোর কাছে সে তাঁবু খাটিয়ে আছে এবং এ অঞ্চলের পাথরগুলোকে পরীক্ষা ক'রে মানচিত্র বদ্ধ করছে। তার সঙ্গীর নাম ডক্টর সুবীর সিংহ, কলকাতায় ডক্টর কল্যাণ বসুর ফরেনসিক ল্যাবোরেটারির রাসায়নিক (কেমিস্ট)। সে রাঁচিতে একটি কাজের সূত্রে সৌরভের ক্যাম্পে বেড়াতে এসেছে। তাদের পরিচয় পেয়ে যোগেন খুব খুশি হয়েছেন ব'লে মনে হল না। মুখে চোখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে তিনি বললেন, 'এত রাত্রে বিরক্ত করতে এসেছেন কেন! ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন নি?'

'না।' সৌরভ জবাব দিল, 'খুব গুরুতর কিছু ঘটেছে বলেই এসেছি। আমার ক্যাম্পের সামনে প্যাটারসনের বাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যে পাথর-টিলার ওপরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠেছে—চোখ-ধাঁধানো নির্ধূম সাদা আগুন।'

'কই এই আগুনের কথা তো বলেন নি আপনি!' —বরেনের মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললেন যোগেন।

'আমার চোখদুটোও ধাঁধিয়ে গিয়েছিল!' কাতর স্বরে বললে বরেন, 'ভাল ক'রে দেখতে পাই নি।'

'নিজের কীর্তি নিজের চোখে দেখতে পান নি!' ঠাট্টার সুরে বললেন যোগেন, 'ভারি মজার ব্যাপার তো!'

তারপর সৌরভ ও সুবীরের দিকে তাকিয়ে যোগেন বললেন, 'বিস্ফোরণ ও তার সঙ্গে আগুন—তা' এই ভদ্রলোকেরই কীর্তি। প্যাটারসনকে লক্ষ্য করে ইনি বোমা ছুঁড়ে ছিলেন। আপনারা সেই বোমারই বিস্ফোরণ দেখেছিলেন।'

'বোমা ছুঁড়ে আপনি ওরকম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন!' —দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে সুবীর বললে: 'হাত বোমা থেকে অমন বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড কি সম্ভব!'

সুবীরের কাছে এসে বরেন ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, 'আপনারা বিশ্বাস করুন, এ বিস্ফোরণ আমার হাত বোমা থেকে হয় নি।'

সুবীর বলল, 'ঠিকই বলেছেন আপনি, সাধারণ হাত বোমা থেকে এমন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না। চলুন, বিস্ফোরণ যেখানে ঘটেছিল সেখানে গিয়ে পরীক্ষা করি। প্যাটারসনকে লক্ষ্য ক'রে বোমাটি যদি ছোঁড়া হ'য়ে থাকে...'

'নিশ্চয়ই ছোঁড়া হ'য়েছে।'—সুবীরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন 'যোগেন, 'প্যাটারসনের ডেড্ বডি প'ড়ে আছে ওখানে।'

'ঐ' ডেড্-বডিটাও পরীক্ষা করা দরকার, এ পর্যন্ত আপনি বোধ হয় তা করেন নি, তাই না?—ব'লে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যোগেনের মুখের দিকে তাকাল সুবীর।

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে প্যাটারসনের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়। সকাল হলেই অবশ্য পোস্ট-মর্টেম করার ব্যবস্থা করব।'

'পোস্ট-মর্টেমের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠাবার আগে চলুন আমরা মৃতদেহটিকে পরীক্ষা করি। আমি ফরেনসিক ল্যাবোরেটারির কেমিস্ট, আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হয়তো আপনাদের কাজে লেগে যেতে পারে...

'আমার অনুরোধ, সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আপনাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সেই সঙ্গে আমাদের পুলিশী তদন্ত দিনের আলোয় করাই বাঞ্ছনীয় হবে। ভয় নেই মৃতদেহ কেউ ঐ পাথর-টিলা থেকে সরাবে না, ওখানে আমার থানার কয়েকজন কনস্টেবলকে মোতায়েন ক'রে এসেছি।'

সকাল হতেই সকলে প্যাটারসনের বাংলোতে গিয়ে হাজির হলেন। বাংলোর বাগানের মধ্যে গ্র্যানিট পাথরের টিলাটিতে গাছপালা কিছুই নেই—নেড়া পাহাড় বলতে যা বোঝা যায়, এ হ'ল তাই।

পাহাড়ের মাথায় প্যাটারসনের মৃতদেহের কাছে এসে চমকে ওঠে সকলে। মৃতদেহটি মানুষের দেহের আকারের ভস্মের স্তূপ। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে বিস্ফোরণের ফলে প্যাটারসনের দেহে আগুন জ্বলে উঠেছিল। যে নির্ধূম আগুন সৌরভের ক্যাম্প থেকে দেখা গিয়েছিল, সেই আগুন প্যাটারসনকে জুড়িয়ে ছাই করেছে।

প্যাটারসনের দেহের ভস্মাবশেষের দিকে এক দৃষ্টি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুবীর বললে, 'সাধারণ হাত বোমা থেকে এমন হতে পারে না। সৌরভ, তোমার কি মনে হচ্ছে?'

'আমার মনে হচ্ছে খুব জোরালো কোন বিস্ফোরণের ফলে প্যাটারসন মারা পড়েছেন এবং তাঁর মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়েছে।'

ঠিক বলেছ, জোরালো কোন বিস্ফোরণ প্যাটারসনকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে। কোন-বোমা থেকে এমন বিস্ফোরণ সম্ভব নয়'

সৌরভ হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বললে, 'এই দেখ সুবীর, গ্র্যানিট পাথরের ওপরেও কি রকম ছাপ পড়েছে এই বিস্ফোরণের! গ্র্যানিটের অন্তর্নিহিত 'ফেলস্পার' কি রকম সাদাটে হ'য়ে গিয়েছে! মনে হচ্ছে অত্যধিক

তাপের প্রভাবে ফেল্‌স্প্যারের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসে গিয়েছে—ফেলস্পার যেন আর কিছুতে পরিণত হয়েছে...'

সুবীর বললে, 'অত্যধিক তাপের প্রভাবেই এটা ঘটেছে—তাই না ?'

'তাপ শুধু নয়, চাপের প্রভাবও রয়েছে।—সৌরভ ঝুঁকে পড়ে পাথর পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'মনে হচ্ছে যেন একটি অতি মাত্রায় উত্তপ্ত বস্তু এই গ্র্যানিট-পাথরের ওপরে আঘাত হেনে তার মধ্যে রূপান্তর ঘটিয়েছে। দাঁড়াও, এর একটা নমুনা নিয়ে নিচ্ছি।'

বলে কোমরের বেল্টের সঙ্গে গোঁজা ছোট ভূতাত্ত্বিকের হাতুড়ি বের ক'রে নিয়ে পাথরে ভেঙ্গে একটি নমুনা তুলে নিল সৌরভ।

পাথরের নমুনাটিকে সুবীর নিয়ে গেল কলকাতায়। ল্যাবোরেটারিতে পরীক্ষা করে এক আশ্চর্য তথ্য উদ্‌ঘাটিত হল। নমুনাটির অন্তর্নিহিত ফেলস্পার (feldspar) যে তাপ ও চাপের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়েছে তা' খালি চোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা এবং রাসায়ণিক বিশ্লেষণ ক'রে বোঝা গেল যে ফেলস্পার রূপান্তরিত হয়েছে মসকালাইনাইট (Maskalynite) নামক একটি খনিজে। ফেলস্পার মসকালাইনাইটে পরিণত হয় উল্কাপিণ্ডের চাপে প'ড়ে। গ্র্যানিটের স্তূপের ওপরে উল্কাপাত হ'লে গ্র্যানিটের ভেতরকার ফেলস্পার উল্কাপিণ্ডের চাপ এবং উল্কাপাতের ফলে সৃষ্টি হওয়া তাপের প্রভাবে মসকালাইনাইটে রূপান্তরিত হতে পারে।

স্পষ্ট বোঝা গেল যে প্যাটারসনের বাংলোর সামনে গ্র্যানিটের ভেতরকার ফেলস্পারের মসকালাইনাইটে রূপান্তর উল্কাপাতেরই ফল। যে বিস্ফোরণ বরেন, সৌরভ ও সুবীর দেখেছিল তা' উল্কাপাত ছাড়া আর কিছু নয়।

বরেনকে ছেড়ে দিলেন যোগেন পাল। উল্কাপাতের ফলে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ ও মৃত্যু পুলিশী তদন্তের আওতায় আসে না তবে তা' নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে—তা' করতে শুরু ক'রে সৌরভ ও সুবীর।

পি-583, দমদম পার্ক, কলি-55

মজার ছবি

প্রণব হোড়

শৃঙ্গ কোণ

নন্দলাল মাইতি

কোণের সঙ্গে পরিচয় আমাদের জ্যামিতি পড়া থেকে নয়, তার অনেক আগে থেকে। ঘরের কোণ, জমির কোণ ইত্যাদির কথা স্কুলে যাবার আগে থেকেই আমরা জানি। তবুও জ্যামিতিতে কোণ কাকে বলে, কেমন করে আঁকতে হয় সব শিখতে হয়। শুধু তাই নয়, আবার এদের মাপতেও হয়। স্কুলে আমাদের তিন-চার রকম কোণের সাথে পরিচয়, আর ওই ক'টি দিয়েই আমাদের কাজ চলে যায়। এরা সরলকোণ, সমকোণ, সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ আর প্রবৃদ্ধকোণ। সরলকোণকে কোণ বলতে প্রথম প্রথম অনেকের দ্বিধা থাকে। কারণ, অপর কোণগুলির সঙ্গে চেহারায় এর মিল কম। কিন্তু যখন যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা হয় বা কোণের সংজ্ঞার সাথে মেলানো হয়, তখন আর একে কোণ না বলে উপায় থাকে না। কোণের সহজ ও সরল সংজ্ঞাটি এরূপ: যখন দুটি রেখাংশ কোন একটি বিন্দুতে মিলিত হয়, তখন যে ছবিটি পাওয়া যায় তাই হচ্ছে কোণ।

যে ক'টি কোণের কথা বলা হলো, তা ছাড়াও আরো নানা ধরনের কোণ আছে। ইউক্লিড তাঁর এলিমেণ্টস গ্রন্থে এ নিয়ে আলোচনাও করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমরা স্কুলে যে জ্যামিতি পড়ি, তা এই গ্রীক গণিতজ্ঞ ইউক্লিডের লেখা। প্রাচীন কালে লিখিত কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ এমন মহাসমাদরে শত শত বছর ধরে পড়া হয় কিনা সন্দেহ। এই এলিমেণ্টস গ্রন্থটি তেরোটি খণ্ডে রচিত; ইংরেজীতে এদের Book বলে। এই গ্রন্থে 450-এর অধিক উপপাদ্য আছে। এই উপপাদ্যগুলি প্রমাণ করার জন্য ইউক্লিড মাত্র পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ ও পাঁচটি স্বীকার্যের সাহায্য নিয়েছেন। স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করা যায় না। তাকে সত্য বলে ধরে নিতে হয়। আসলে 'এর প্রমাণ কি', 'এর প্রমাণ কি' বলে উত্তর দিতে থাকলে বা প্রমাণ দিতে থাকলে এক সময় এক জায়গায় এসে থেমে যেতে হয়। অর্থাৎ তারপর আর প্রমাণ দেওয়া যায় না। তাই জ্যামিতি শিখতে হলে প্রথমে স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য-গুলি জেনে নিতে হয়।

ইউক্লিড প্রথম খণ্ড থেকে উপপাদ্যগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। প্রথমে সহজ, তারপর ক্রমশ কঠিন। স্কুলে আমাদের এলিমেণ্টসের প্রথম থেকে তিন-চার খণ্ড মাত্র পড়তে হয়; তাও সব নয়,—নির্বাচিত কয়েকটি মাত্র।

তাঁর এলিমেণ্টসের তৃতীয় খণ্ডে মোট 37টি উপপাদ্য আছে। প্রথমেই আছে সংজ্ঞা,—বৃত্তের সংজ্ঞা। তারপর তিনি জ্যা, স্পর্শক, কেন্দ্রস্থকোণ ইত্যাদির ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই খণ্ডের ষোড়শ উপপাদ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার। এখানে তিনি এক ধরনের কোণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইউক্লিড স্বয়ং এই কোণটির কোন নামকরণ করেননি। আর প্রাচীন কালের অধিকাংশ লেখাই বড় সংক্ষিপ্ত,—বিস্তারিত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের ভাষ্যকারেরা বিশদ ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী করেন। তা না হলে প্রাচীনকালের অনেক লেখা বোঝা দুরূহ হয়ে উঠত, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো বা একেবারেই বোঝা যেত না। যাই হোক, ইউক্লিডের পরবর্তীকালের অনেক গণিতজ্ঞ তার বিশেষ কোণটিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং এই নিয়ে আলোচনাও করেছিলেন। তাঁরাই এই বিশেষ কোণটির নাম দেন শৃঙ্গ কোণ (horn angle)। 'শৃঙ্গ' শব্দের অর্থ 'শিং'। কেন যে এই কোণটির এরকম নাম দেওয়া হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। কিন্তু মনে হয়, এই কোণটির সঙ্গে গরু বা মোষের শিং-এর একটা সাদৃশ্য আছে। সেই-জন্যেই সম্ভবত এরকম নাম দেওয়া হয়েছিল। 1নং ছবিটি দেখলে কিছুটা অনুমান করা যায়:

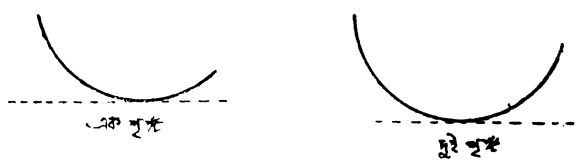

কিন্তু ওই শিংরূপী কোণটি গ্রীক গণিতজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। আর শুধু গ্রীক গণিতজ্ঞরা কেন, মধ্যযুগে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞবিজ্ঞানীদের মধ্যেও বিতর্কের বিষয় ছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ কার্ডান, ভিয়েটা, গ্যালেলিও, ওয়ালিশ প্রমুখ। কিন্তু বিতর্ক কি নিয়ে? বিতর্ক একেবারে মূল নিয়ে অর্থাৎ এই কোণটির অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না এবং তার মাত্রা বা পরিমাণও আছে কিনা। ইউক্লিডের উত্তর-সূরীদের মধ্যে অনেকে একে কোণ বলে স্বীকার করতেই চাননি, কিন্তু চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রীক

গণিতজ্ঞ ও ভাষ্যকার প্রোক্লাস একে কোণের স্বীকৃতি দান করেন।

আমরা আগেই বলেছি, এলিমেন্টসের তৃতীয় খণ্ডের ষোড়শ প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করে এই কোণের উদ্ভব। এখন, সেই প্রতিজ্ঞাটি বিবৃত করা যাক।

বৃত্তের ব্যাসের প্রান্ত-বিন্দু দিয়ে সমকোণে কোন সরলরেখা অঙ্কন করলে, তা বৃত্তের বাইরে থাকবে; এবং পরিধি ও সরলরেখার মধ্যে আর কোন সরলরেখা অঙ্কন করা যাবে না। অধিকন্তু, যে-কোন ঋজুরেখ সূক্ষ্মকোণ অপেক্ষা অর্ধবৃত্তের কোণ বৃহত্তর এবং অবশিষ্ট কোণ ক্ষুদ্রতর হবে।

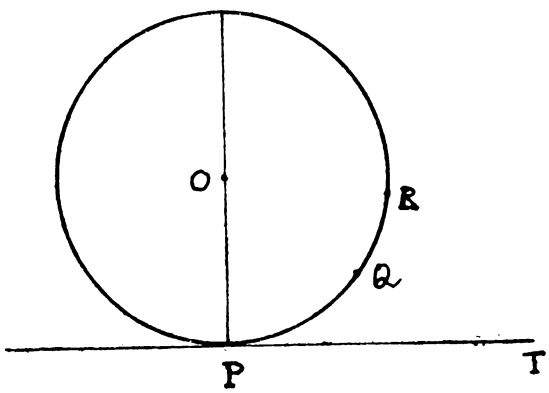

ছবিতে TP স্পর্শক এবং PQR বৃত্তের চাপ। ইউক্লিড তাঁর প্রতিজ্ঞায় TP এবং PQR চাপের মধ্যবর্তী কোণের কথা বিবেচনা করেছেন। আর গ্রীকদের মতে এটিই শৃঙ্গকোণ এর পরিমাণই তর্কের বিষয়। কেবল দু-একশ' বছর ধরে নয়,—প্রায় সতেরো-আঠারো শ' বছর ধরে। প্রতিজ্ঞা থেকে জানতে পারা যাচ্ছে, যে-কোন ঋজুরেখ সূক্ষ্মকোণ অপেক্ষা এই কোণ অর্থাৎ তথাকথিত শৃঙ্গ কোণের মান ক্ষুদ্রতর হবে। কিন্তু কত ছোট হবে ধারণা করা কঠিন, এবং ইউক্লিড এর মান শূন্য হবে বলেননি। যাই হোক, প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী দুটি বক্ররেখার অন্তর্গত শৃঙ্গ কোণের মান শূন্য বলে মনে করা হয়।

ইউক্লিড আলোচ্য প্রতিজ্ঞায় আর একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, TP স্পর্শক ও PQR চাপের মধ্যবর্তী কোন স্থান এবং P-এর মধ্য দিয়ে আর কোন সরলরেখা অঙ্কন করা যাবে না।

আধুনিক জ্যামিতি গ্রীক জ্যামিতির নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। বর্তমানে জ্যামিতির অনেক নতুন নতুন শাখার আবিষ্কার হয়েছে। সেইসব জ্যামিতিতে ইউক্লিডের অনেক সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নয়। ওই সব জ্যামিতিতে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ হয় না,—দুই সমকোণের চেয়ে ছোট হতেও পারে, আবার বড় হতেও পারে। তবুও ইউক্লিডের গবেষণা, মনস্বিতার উপর আমাদের জ্যামিতি শেখার দৃঢ় ভিত্তি। তাঁর এক একটি সিদ্ধান্ত, গবেষণা ও আবিষ্কার যেমন কৌতূহলের, তেমনি চিন্তা-ভাবনারও বটে। শুধু তাই নয়, তাঁর পঞ্চম স্বীকার্য অবলম্বন করে এবং তার যাথার্থ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে বিখ্যাত রুশ গণিতজ্ঞ লোবাচেভস্কি এক ধরনের জ্যামিতি আবিষ্কার করেন। তাঁর জ্যামিতি সাধারণত অন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নামে পরিচিত। আর এক ধরনের অন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি আবিষ্কারক হচ্ছেন বিখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ রীম্যান।

ঠাকুরানীচক, হুগলী, 712 613

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২.৫০ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২৫ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। **under certificate of posting**-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- **M. O.** বা **Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN**-এর নামে পাঠাতে হবে।

পরিচিত গাছ ধুতরো

নির্মাল্য চক্রবর্ত্তী

ধুতরো গাছ তোমরা সকলেই হয়তো দেখেছ। এর ফলও নিশ্চয় দেখেছো। ফল দেখতে ভারী চমৎকার কিন্তু প্রাণনাশক। এই গাছকে কেউ বলে ধুস্তর, কেউ বলে ধুরণ, হিন্দিতে এই গাছকে বলে ধতুরা বা ধতুর ইত্যাদি নানান যায়গায় নানান নাম। বৈদিক অভিধানে ধূস্তর শব্দটিকে ভেঙ্গে দেখান হয়েছে—ধূর = উর্দ্ধগতি, তুর = গতি অর্থাৎ কিনা উর্দ্ধগতি। ধুতরো ফলের বীজ আবার এত বেশী ধুরন্ধর যে চিবিয়ে খেলে এর বিষ সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে মাথার মধ্যেকার সব শিরা, উপশিরা ও *জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সরাসরি আক্রমন করে এবং উন্মাদ করে* দেয়। আমাদের দেশে অবশ্য ধুতরো ফুল ধার্মিক দৃষ্টি-কোন থেকে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ; কেন না মহাদেবের নাকি এই ঘণ্টাকৃতি সাদা ফুলটি খুব প্রিয় তাই শৈবদের কাছে এফুলের খুব সমাদর। শতাধিক বৎসর আগে থেকেই দঃ আফ্রিকা ও আফ্রোএশিয়ানরা এই গাছে magico—religious rits আছে বলে মনে করত। কথাটা সত্যি, তখন মানুষ জানতোনা এর কারণ কি, পরে বৈজ্ঞানিকরা নানান পরীক্ষা করে বলেন যে এই গাছের মধ্যে narcolic tranquillising অর্থাৎ নিদ্রাকারক ও রোগ উপশমের গুণ বর্ত্তমান।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ এটা প্রমাণ করেছেন যে এই গাছের প্রায় প্রত্যেকটি অংশেরই বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কিছুনা কিছু ক্ষমতা আছে।

এমনিতে এ গাছকে আমরা এখানে সেখানে বড় হতে দেখি তবে বিজ্ঞানীদের মতে গরম আবহাওয়াবিশিষ্ট যায়গাতেই এই গাছের অনেক উপকারিতা আছে। এই গাছের মধ্যে কয়েক ধরণের alkaloids পাওয়া যায় যার মধ্যে Scopalamine উল্লেখযোগ্য। এই Scopalamine অত্যাধিক বিষাক্ত হওয়ায় মানসিক রোগ, বিকার, পাগলদের রোগ উপশমে ডাক্তাররা এই গাছ থেকে তৈরী ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়াও S rgery তে রোগীকে অজ্ঞান করার জন্যও Scopalamine এর ব্যবহার হয়। *ধুতরো গাছের পাতার রসের প্রলেপে বিভিন্ন রকম* শারীরিক ব্যাথার উপশম হয়। এই গাছ থেকে এক রকম তেল তৈরী হয় যার নাম 'কণক তৈল' যা দিয়ে কানের

ব্যাথায়, যারা পায়ের তলা কেটে গিয়ে কষ্ট পান তাদের জন্য খুব উপকার করে। ধুতরো গাছের পাতার ধোঁয়া হাঁপানী রোগীদের পক্ষে উপকারী।

ধুতরো গাছ অনেক রকমের হয়। সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় এর 15-20 রকম প্রজাতি বিশিষ্ঠ গাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে 10 টি প্রজাতির গাছ আমাদের দেশেই পাওয়া যায়। গুল্ম শ্রেণীর এই গাছকে বৈজ্ঞানিকেরা Solauaceae (সোলেন্যাসি) পরিবার ভুক্ত করেন। বিভিন্ন ধরণের

গাছ যেমন সাদা, নীল, কাল, হলুদ ইত্যাদি হয়ে থাকে তবে সব গাছেরই কার্য্যকুশলতা সমান নয়। এদের মধ্যে কালধুস্তর সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল।

বিহারে ও কোচবিহারে একধরণের গাছ দেখতে পাওয়া যায় যার উচ্চতা প্রায় 7-8 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ধুতরো গাছের ফুল সাদা বড় ঘণ্টার মত দেখতে, ফল হয় আলুর মত গোল তবে উপরটা আলুর মত মসৃণ নয় কাঁটায় ভরা। তুলনামূলকভাবে D. Stramonium গাছটি একটু মসৃণ হয়। আমাদের দেশে মুখ্যতঃ D. innoxia, D. Stramonium, ও D. metel থেকে বেশী ওষুধ তৈরী হয়।

এভাবে দেখা যায় যে আমাদের চোখের সামনে কত-রকমের গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যত্নে, অযত্নে বেড়ে চলেছে। প্রত্যেকটি গাছের মধ্যেই কিছুনা কিছু গুণ আছে তবে আমাদের তা বিন্দুমাত্র জানবার প্রয়াস নেই। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের হাতের কাছে নানান গুণ সম্পন্ন গাছ থাকা সত্বেও তাদের গুণাগুণ জানাতো দূরের কথা তাদের নামও জানিনা তার জানবার চেষ্টাও করিনা।

সিংহলজ (কাস্টর্স টাউন), বি দেওঘর জেলা ঃ দেওঘর, 814112।

ভারী পদার্থের ওজন

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন পদার্থ হাতে নিয়ে ভারী বোধ হলে, আমরা বলে থাকি এ যেন সীসার (লেড) মতো ভারী। সীসা বেশ ভারী পদার্থ তাই এরূপ কথা বলা হয়, তবে সীসার থেকে ভারী পদার্থ এই পৃথিবীতেই আছে, আর পৃথিবীর বাইরে তারামণ্ডলীতে যেসব পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে তার ওজন জানবার পর পদার্থবিদরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ; যারা প্রথম শুনবেন তারাও অবাক হবেন। এক গ্রাম জলের যতটা আয়তন হয়, ঠিক সেই আয়তনের সীসা নিয়ে ওজন করলে তার ওজন হবে 11·37 গ্রাম, আর তরল ধাতু পারদের ঐ আয়তনে ওজন হবে 13·6 গ্রাম। এছাড়া ভারী ধাতু প্লাটিনামের ঐ আয়তনে ওজন 21·50 গ্রাম। এই হল পৃথিবীর কয়েকটি ভারী পদার্থের ওজন, ধাতুর মধ্যে হালকা হল পটাসিয়াম, ঐ আয়তনের পটাসিয়ামের ওজম হয় ·16 গ্রাম।

এখন এক গ্রাম জলের আয়তনের সমান আয়তন নেওয়া হচ্ছে কেন—সেকথা বলি। এক গ্রাম জলের আয়তন হল এক ঘন সেমি, একেই আয়তনের ক্ষুদ্রতম একক ধরা হয়, একক আয়তনের ভরই হল পদার্থের ঘনত্ব অর্থাৎ পদার্থের ঘনত্ব প্রকাশ করবার জন্যই ঐ আয়তন নেওয়া হয়েছে।

এবার আমাদের জানা তারামণ্ডলীর পদার্থের ঘনত্বের কথায় আসা যাক্। 1862 সালে আবিষ্কৃত লুব্ধকের নিকটবর্তী ছোট্ট তারাটি (সিরিয়াস B বা ছোট লুব্ধক এর) সম্বন্ধে জানা গিয়েছে এটি যে পদার্থের তৈরী তার ঘনত্ব 60 কেজি প্রতি ঘন সেমি. এর চেয়ে ভারী পদার্থ দিয়ে তৈরী ভ্যান-মা-আন তারা। এর পদার্থের ঘনত্ব 400 কেজি প্রতি ঘন সেমি, 1935 সালের শেষ দিকে ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্র মণ্ডলীতে আর একটি তারা আবিষ্কৃত হয় যার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের এক তৃতীয়াংশ এবং ভর সূর্যের ভরের প্রায় $2\frac{4}{5}$ গুন, এই তারাটি যে পদার্থের তৈরী তার ঘনত্ব 36 টন প্রতি ঘন সেমি। অর্থাৎ এর দেহ থেকে এক গ্রাম জলের আয়তনের সমান পদার্থ পৃথিবীতে এসে পড়লে তাকে উন্নত ক্রেনের সাহায্যেও তুলতে পারা যাবে কিনা সন্দেহ হয়, কেমন মজা তাই না, কতটুকু বস্তুকে তুলতে কি বিরাট ব্যবস্থা নিতে হয়। এই খানে এসেই বস্তুর ভর থেমে গেল না। এই ঘনত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে এই তারারই কেন্দ্রের পদার্থ, বিজ্ঞানীদের মতে ঐ পদার্থের ঘনত্ব 100 টন প্রতি ঘন সেমিতে।

এই পর্যন্ত না হয় পদার্থের ভর পাওয়া গেল। কিন্তু আর কত বেশী ঘনত্ব হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে পদার্থের অনুর গঠন বিশ্লেষণ করলে, পরমানুতে ভারী কণা প্রোটন ও নিউট্রনের একটি কেন্দ্রক থাকে। ঐ কেন্দ্রককে ঘিরে ইলেকট্রনগুলি কতকগুলি কক্ষপথে পাক খায়। ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন সহ পরমানুর যা ব্যাস হয় কেন্দ্রকটির ব্যাস তার কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু পরমানুটির ওজন নিহিত থাকে ঐ কেন্দ্রকে। যে পরমানু কেন্দ্রক তার ইলেকট্রন গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনের অভাবে তার ব্যাস কয়েক হাজার গুন কমে যায়। অথচ ওজনের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না, আবার নক্ষত্র গর্ভে প্রচণ্ড চাপে এই পরমানু কেন্দ্রকগুলি সাধারণ পরমানুর তুলনায় পরস্পরের হাজার হাজার গুণ কাছে আসতে পারে। এর ফলেই এইরূপ ঘনত্বের পদার্থের সৃষ্টি হয়।

তত্ত্বের দিক দিয়ে পারমাণবিক কেন্দ্রকের ব্যাস পরমানুর ব্যাসের 1/10000 ভাগের বেশী হয় না। সুতরাং কেন্দ্রকের আয়তন পরমানুর 1/10000 কোটির বেশী হবে না। এক ঘন মি ধাতুতে 1/1000 ঘন সি. সি কেন্দ্রক থাকে, ধাতুর সমগ্র ওজন এই ক্ষুদ্র আয়তনে ঘণীভূত থাকে। তাই এক ঘন সেমি কেন্দ্রকের ওজন হবে প্রায় 10000000 টন।

1, মনোমোহন বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-6

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র : লেখা ও ছবি / দিলীপ দাস

এদিকে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সুবিধার জন্য বিভিন্ন মহলের লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে তাঁকে জন-সমক্ষে তুলে ধরতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চললেন।

পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস ওলি বুল নাম্নী এক উদার মনোভাবাপন্না নারীর সঙ্গে। তিনি জগদীশচন্দ্রকে সন্তান স্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করেছিলেন অকাতরে।

এবার শুরু হল গ্রন্থ রচনার কাজ। গ্রন্থের সাহায্যে তাঁর গবেষণার ফলাফল আগেভাগেই বিশ্বগোচর করার সিদ্ধান্ত নেন। এই দুরূহ কাজের দায়িত্বও স্কন্ধে তুলে নেন স্বয়ং নিবেদিতা

এদিকে তাঁর ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। শরীরও ভাল যাচ্ছে না। কাজও অসম্পূর্ণ। জগদীশচন্দ্র গেলেন ইণ্ডিয়া অফিসে – আরও ছুটি চাই।

না। আপনাকে আর ছুটি দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু কলেজে আমার এক বছরের ছুটি পাওনা আছে

সে ছুটির জন্য নিজে ভারতে গিয়ে মঞ্জুর করিয়ে আসতে হবে। এতে আমাদের কোন হাত নেই।

আমি এখানে বৈজ্ঞানিক ডেপুটেশনে এসেছি। এ ব্যাপারে আপনারা ভারত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দেখুন।

বেশ। তবে আপনার রিসার্চের কাগজপত্রের কপিগুলো রেখে যান। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে আপনাকে জানাবো

ঠিক আছে, রেখে যাচ্ছি

দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই কাগজ-পত্র গিয়ে পড়ল তাঁর বিরুদ্ধবাদী শরীর বিজ্ঞানীদের হাতে। ফলে তারা জগদীশচন্দ্রের এই গবেষণাকে মূল্যহীন বলে উড়িয়ে দিল।

এই নিন আপনার কপিগুলো। রিপোর্টে জানা গেল – অর্থহীন, আপনার এই রিসার্চের কোন মৌলিকত্ব নেই। সুতরাং আপনাকে ফিরে যেতেই হবে

খুদে বৈজ্ঞানিক

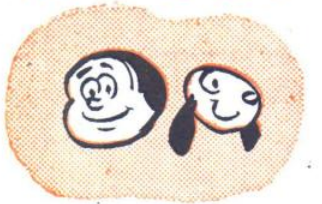

দিলীপ দাস

দূর হতভাগা! এটা কি আমি ইচ্ছে করে করেছি? বে-খেয়ালে এমনটা হয়ে গেল!
ঘরটা তো জলে জলাক্কার করে ফেলেছিস। এখন যদি কেউ দেখে ফেলে?
তার আগেই যদি কোন প্রকারে বাষ্পীভূত করা যায় তবে আর কোন ভাবনা নেই। অবশ্য তার জন্যে হিট দরকার।
রাইট। আমার কথাটা তুই ঠিক গ্রহণ করেছিস!
ইস্তিরী দিয়ে কি হবে রে?
জল ভেপারাইজ্ করবো
মুহূর্তে মেঝে শুকনো খটখটে আগের মত হয়ে যাবে
কি-কিন্তু!
স-স-স-
আরে, ঐ জানালাটা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কেন?
হুম্! ঘরের ভেতর এসব কি হচ্ছে র‍্যা?
জল বাষ্পীভূত করা হচ্ছে!
স-স-স-স
কি ভূত?
হ্যাচাং
ইক!
বস্কু তোর ভিজে মেঝেতে পা হড়কেছে! উঠে বসার আগেই পালিয়ে চল, নয়ত —
তোর যত্তোসব বিদঘুটে ব্যাপার! একটা কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই হত, তা নয়— ইস্তিরী দিয়ে জলকে বাষ্প করে শুকানো। এখন বোঝ ঠ্যালা!
রাইট। এটা হল জলের আর একটা গুণ, সংপৃক্ত হওয়া।
তোর গুণ্ড রাস্কেল!

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

॥ দশ ॥

অলীক আর্তনাদ

'স্টপ ইট। স্টপ ইট। আই সে—স্টপ ইট।'

একবার নয়, বারবার কেউ ভূতুড়ে গলায় ধমক দিতে থাকল। সেই কণ্ঠস্বর যে মানুষের নয়, আমি হলফ করে বলতে পারতুম। থমকে দাঁড়িয়ে গেছি এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। 'স্টপ ইট। স্টপ ইট। আই সে—স্টপ ইট'—ঝাঁকুনি খেতে খেতে শব্দগুলো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে প্রতিধ্বনির মতো। তারপর তাদের তীব্রতা ক্ষয়ে যাচ্ছে। হেঁপো রুগীর মতো শ্বাস-প্রশ্বাস জড়ানো গলায় মাথাকুটে নিষেধ করার ভঙ্গীতে কেউ কাউকে কিছু করতে বারণ করছে। তারপর শব্দগুলো শ্বাসপ্রশ্বাসে মিশে যেতে থাকল। ক্রমশ ফিসফিস করে সেই অদৃশ্য নিষেধকারী কাউকে বলতে থাকল, 'স্টপ্ ইট! স্পট্ ইট! আই সে—স্টপ ইট!' তারপর যেন বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

সেই চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রার বাজনার দিকে কান গেল এবার। বাজনাটাও ততক্ষণে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মনে হল, যেন আমার মাথার ভেতরই সেই আশ্চর্য সুন্দর সঙ্গীত শুনছি—অসংখ্য ঝিল্লির ডাকের মতো, অতি মৃদু, শ্রুতিপারের সেই ধ্বনি।

তারপর তাও একই ভাবে মিলিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে কী এক অনুভূতি ঝিলিক দিল। এ আমি কোথায় এসে পড়েছি তাহলে? আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সকালবেলার শান্ত নরম রোদে সবুজ বনভূমি ঝলমল করছে। উঁচু ও নিচু, ছোট এবং বড়, স্থূল এবং শীর্ণ নানা আকৃতির উদ্ভিদ। তাদের অনেকেই থরে থরে ফুলে ফুলে সাজানো। মাটির ঘাসে ফুলের গয়না পরে পরীদের মতো পা ছড়িয়ে বসে আছে কেউ কেউ। সুগন্ধে বাতাস মউমউ করছে। চারদিকে এখন যেন শব্দহীন হাসি, যেদিকে তাকাই সেদিকেই বালক বালিকারা খুশিখুশি মুখে এক বিদেশী অতিথিকে বরণ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে বলে ভুল হয়। কোথাও দেখি সারবদ্ধ ঋজু বৃক্ষ প্রাজ্ঞ মানুষের গাম্ভীর্য নিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করছে। কোনো-কোনো বৃক্ষ যেন ভ্রূ কুঞ্চিত করেছে—সন্দেহকুটিল সংশয়ান্বিত ভঙ্গী। ফলভারে নুয়ে পড়া এক বৃক্ষ বুঝি জননীর স্নেহে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তরুণ বৃক্ষেরা তাদের বলিষ্ঠ পেশল বাহু বাড়িয়ে হয়তো আমাকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। এ আমি কোথায় এলুম? প্রতিটি ঝোপঝাড়, গাছ, ঘাসের শব্দহীন ভাষা যেন আমার বোধের ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। লক্ষ লক্ষ কথা নিঃশব্দে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমার মস্তিষ্কে—মস্তিষ্ক থেকে মনে। সেই সব দুর্জ্ঞেয় কথা স্পন্দনের হ্রদ-দীর্ঘ তরঙ্গিল রেখায় বিচিত্র কোডের মতো জমে উঠছে আমার মস্তিষ্ক-কোষে। এত বুঝি এক অদৃশ্য বেতার তরঙ্গ। কিন্তু ডি-কোডিং পদ্ধতি আমার জানা নেই বলে অর্থ নিষ্কাশন করতে পারছি না। অসহায়, ব্যর্থ, বিষণ্ন এক মানুষ ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি এক বিরাট মৌন চেতনার দরজায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি আর তাকিয়ে আছি।

হঠাৎ আমার তন্ময়তা কেটে গেল। স্বপ্নবৎ আচ্ছন্নতা ঘুচে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা জ্ঞান—যা এতক্ষণ আমার নাগালেই ছিল, অথচ গ্রাহ্য করিনি। আর সেই জ্ঞান আমাকে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনায় আনন্দে বদ্ধ উন্মাদে পরিণত করে ফেলল। আমি বিজ্ঞানী আর্কিমেডিসের ইউরেকা বলে চিৎকার করে ছোটাছুটি করার ভঙ্গীতে 'কিওটা! কিওটা!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এবং দুহাত তুলে লম্ফঝম্ফ করতে করতে দৌড়ে গেলুম। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা অংশ দিয়ে ঢুকে একটা খোলামেলা সবুজ মাঠের ওপর ধপাস করে পড়ে বারকতক গড়াগড়ি খেলুম। তারপর আবার দৌড়ুতে শুরু করলুম। আমি সত্যি সত্যি বদ্ধ পাগলের মতো চিৎকার করছিলুম, 'কিওটা! কিওটা! কিওটা!'

হ্যাঁ, এই সেই আশ্চর্য দ্বীপ কিওটা। কোথাও রঙ্গো-

বদ্ধ পাগলের মতো চিৎকার করছিলুম, কিওটা!
কিওটা! কিওটা!

রঙ্গো পুঁথিতে বর্ণিত 'স্পিকিং উডস'—কথা বলা বনের দেশ। এই সেই প্রাচীনযুগের নাবিকদের কিংবদন্তীর দ্বীপ 'সঙ্গীতকারী বৃক্ষের বাসস্থান কিওটা!'

ঘাসের ভেতর লুকিয়ে থাকা পাথরে টোক্কর খেয়ে ছিটকে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদনাটা কেটে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালুম। নিজের পাগলামির কথা ভেবে খারাপ লাগল। এবার আমার সবচেয়ে জরুরি জিনিস হল মানসিক সুস্থতা।

ঘাসের মাঠটা বিশাল। এখানে-ওখানে উজ্জ্বল নানা রঙের পাথর ছড়িয়ে আছে। কোথাও একলা কোনো গাছ বা ঝোপ, কোথাও নিবিড় উঁচু ঘাস। একটা নিচু ঝাঁকড়া গাছে আপেলের মতো ফল ধরে আছে দেখে সেদিকেই এগিয়ে গেলুম। ওগুলো রেডকুট বলে মনে হচ্ছিল। কয়েক পা যেতেই এক অবাক কাণ্ড ঘটল। রুবিদ্বীপে রাজাকোর যাদুঘরে ব্যুমেরাং-আকৃতির যে জ্যান্ত জিনিসটা দেখেছিলুম, কর্নেলকথিত সেই 'কাঠকার'র একটা ঝাঁক ঘাসের ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠল। তারপর দল বেঁধে লাফাতে লাফাতে উঁচু ঘাসবনের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

ফলের গাছটার তলায় চওড়া বেদীর মতো পাথর। সেটাতে চড়ে একটা ফল ভাঙতে হাত বাড়িয়েছি, একটা হাতে ডাল ধরে নুইয়ে রেখেছি, অমনি ডালটা আমার হাত ছাড়িয়ে সটান সোজা হয়ে গেল। নাগাল পেলুম না। তারপর যে ডালটা ধরতে যাই, একই কাণ্ড। গাছটা প্রাণীর মতো জ্যান্ত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে সক্ষম দেখে হতবাক হয়ে গেলুম। একটু পরে গাছটার সবগুলো ডাল সোজা হয়ে গেল। প্রকাণ্ড এবং বেঁটে তালগাছের মতো দেখাল গাছটাকে। আমি তার দিকে চেয়ে কাকুতিমিনতি করে বললুম, 'লক্ষ্মী ভাইটি! বড্ড খিদে পেয়েছে। অমন কোরোনা!'

আমার দুর্ভাগ্য, মানুষের ভাষা ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। ইশারা-ইঙ্গিত করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে সত্যি আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিন্তু হতচ্ছাড়া গাছটা তেমনি সাধুর মতো ঊর্ধবাহু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোভনীয় রঙীন ফলগুলি আমার নাগালের বাইরে উঁচুতে দুলতে থাকল।

এতক্ষণে আমার মাথায় এল, এর মধ্যে হয়তো আজগুবি ব্যাপার নেই। লজ্জাবতী লতার মতো কোনো প্রাকৃতিক নিয়মেই গাছটার মধ্যে সংকোচন ঘটেছে আমার ছোঁয়ায়। গাছটার গুঁড়িতে থোঁচাখোঁচা কাঁটাও রয়েছে। একটু তফাতে সরে গিয়ে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিলুম।

পাথরটা ছুঁড়তে যাচ্ছি, হাতের তালু ছ্যাঁক করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা ফেলে দিলুম। তারপর দেখি, ও হরি! ওটা আদতে পাথরেই নয়—ধুসর রঙের একটা প্রজাপতি। ডানাগুটিয়ে পড়েছিল ঘাসের ফাঁকে। ভারি অদ্ভুত প্রজাপতি তো!

এবার কালো রঙের সত্যিকার একটা পাথর কুড়িয়ে নিলুম। পাথরটা ফল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলুম। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ফলগুলোও যেন অসম্ভব ধূর্ত। পাথরের লক্ষ্যপথ থেকে কেমন ঝটপট সরে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলুম। এতক্ষণে আবিষ্কার করা গেল, এই দ্বীপে নারকোল গাছ নেই। শুধু তাই নয়, এখানকার সব গাছ—সমস্ত উদ্ভিদ যেন অন্যরকমের। কোনোটাই আমি এর আগে দেখিনি কোথাও। এমন কী যে ঘাসগুলো আমি মাড়িয়ে এলুম, সেগুলোও আমার অচেনা। যত রকমের ঘাস আজীবন দেখেছি, তার সঙ্গে কোনো মিল নেই এ ঘাসের। ভেলভেটে বোনা পুরু এবং নকশাদার এই ঘাসের সৌন্দর্য বিস্ময়কর। লক্ষ্য করে দেখলুম, কোথাও রুগ্ন, হাড়জিরজিরে কোনো গাছ নেই। প্রত্যেকটি সবল, নিটোল, বর্নাঢ্য—যেন ছবিতে যত্ন করে আঁকা।

একটা প্রকাণ্ড গাছের গায়ে হাত রেখেই চমকে উঠলুম। কোনো প্রাণীর গায়ে হাত রাখলে যে অনুভূতি অবিকল। বৃক্ষের প্রাণ আছে সে তো জানি! কিন্তু এত প্রাণ! এত তীব্র চেতনা! আমার দিকে তাকিয়ে আছে তীব্র চেতনাসম্পন্ন উদ্ভিদরূপী প্রাণীযুথ যেন।

একটা ঝোপে আঙুরের গুচ্ছগুচ্ছ ফল দেখে সেদিকে ব্যস্ত ভাবে ছুটে গেলুম। গোলাপী রঙের সুন্দর ফলগুলি রসে টলটল করছিল। কিন্তু হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, কে যেন নিষেধ করছে।

কোনো কণ্ঠস্বর শুনিনি, অস্বাভাবিক নির্জনতা ছমছম করছে চারদিকে। অথচ আমার মনে হল, আমার মাথার ভেতর ঝিঁঝিঁপোকার মতো শ্রুতিপারে এক অনুভূতিময় সুর একটা নিষেধাজ্ঞা শোনা যাচ্ছে। কে যেন বলছে, ওই সুন্দর ফলগুলো বিষাক্ত।

মন থেকে ধারণাটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলুম না। একি আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বোধ? সঠিক বলা কঠিন। যে বোধ মানুষকে অনেক সময় বিপদের পূর্বাভাস দিয়ে সতর্ক করতে চায়, এ কি সেই বোধ? প্রাণীদের মধ্যে এই বোধ এখনও লুপ্ত হয় নি—প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও হয়তো এই ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কিন্তু সেই বোধ আমার মতো একজন সভ্য জগতের আধুনিক মানুষের মধ্যে টিঁকে আছে—নাকি কিওটা দ্বীপে পৌঁছুনোর পর কোনো প্রাকৃতিক নিয়মে তা ফিরে এসেছে আমার মধ্যে?

ব্যাপারটা যাই হোক, ফলের ঝোপটার সঙ্গে আমার যেন একটা টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ ঘটছিল। আমি সেখান থেকে হতাশ হয়ে সরে গেলুম অন্যখানে।

খাদ্যের সন্ধান আমাকে করতেই হবে। বরং সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখি, যদি মাছ মারতে পারি।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। এদিকটায় জঙ্গল খুব ঘন। অসংখ্য গাছ বুড়ো হয়ে ভেঙে পড়েছে কালক্রমে। তার ওপর আবার গাছের চারা গজিয়েছে। এতক্ষণে পাখির ডাক কানে এল। তাহলে কিওটাতে প্রাণীও আছে! মনে হল, দ্বীপের পাখিরা আমার মতো এক আগন্তুককে দেখে যেন ভয় পেয়ে এত ক্ষণ আড়ালে সরে গিয়েছিল। ক্রমশ সাহস পেয়ে তারা একে একে বেরিয়ে আসছে এবং মন খুলে গান গাইতে শুরু করেছে। কিন্তু চেষ্টা করেও একটা পাখি আমার চোখে পড়ল না।

তারপর একটা প্রকাণ্ড ময়াল জাতীয় প্রকাণ্ড সাপকে একটা গাছের ডালে ঝুলতে দেখলুম। হ্যাঁ—সাপও আছে। কিওটা তাহলে মানুষের পক্ষে একটা নিরাপদ জায়গা নয়। এক দৌড়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে হাজির হলুম। এবার সাপের কথা ভেবে বুক ঢিপঢিপ করছিল।

সূর্যের অবস্থান দেখে বুঝতে পারলুম এদিকটা উত্তর দিক। আমি দ্বীপে এসেছি পূর্বদিক থেকে। সামনে বিস্তীর্ণ জলের পর প্রবাল পাঁচিল কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁদিকে টানা বিচ ক্রমশ ঘুরে গেছে দক্ষিণে। বিচের বাঁকের মুখে পাহাড়ী খাড়ি। এখানে জলটা তত পরিষ্কার নয়। ঢেউয়ের চোটে বালি ভেসে উঠছে। চাপচাপ শ্যাওলা জাতীয় দামও আছে জলের ভেতর। তাই ভাবলুম, খাড়ির জলটা পরিষ্কার হতে পারে। ওখানে পাথরের ফাঁকে নিশ্চয় মাছের ঝাঁক চোখে পড়বে।

যেতে যেতে বাঁদিকে জঙ্গলের ভেতর বেহালার বাজনা শুনে থমকে দাঁড়ালুম। সত্যি বাজছে, নাকি কানের ভুল, ঠিক করতে পারলুম না। কিন্তু বড় করুণ সুর সেই অলীক বেহালার। এ এক আশ্চর্য মায়াজগত যেন, যেখানে যখন তখন বেজে ওঠে গম্ভীর অর্কেস্ট্রাধ্বনি কিংবা বেহালা সুর। বিচিত্র অনুভূতি জেগে ওঠে মনে।

হ্যাঁ—সাপও আছে

আবেগে হৃদয় দুলতে থাকে। সুরটা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু সব মিথ্যা পেট সত্য বহুকাল আগেই পথের ধারে এক দেহাতী ম্যাজিসিয়ানের মুখে খেলার শেষে শুনেছিলুম এই পরম সত্য কথাটা। খিদে আর তেষ্টার কথা সম্ভবত যত ভাবা যায়, তত বেড়ে ওঠে। ক্যারিবোর রুটি-জ্যাম-সসেজ সেই মধ্যরাতে সমুদ্রের বুকে সাবাড় করেছি। এখন সেকথা ভেবে জিভে জল আসছিল। অদৃশ্য বেহালাবাদক সেটা টের পেয়েই যেন হঠাৎ বাজনা বন্ধ করে দিল।

বাঁকের মুখে খাড়ির ধারে এসেই মন নেচে উঠল। পাহাড়ের মাথায় একখানে শাদা একটা রেখা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলুম। না—চোখের ভুল নয়। ওটা একটা ঝর্না। সরু ফিতের মতো নেমে এসে লোনা খাড়ির জলে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে।

এরপর নিজের তৎপরতায় নিজেরই অবাক লাগছিল। খাড়িতে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। তার ফাঁকে অতি স্বচ্ছ জলে ম্যাকারেল জাতীয় মাছের ঝাঁক খেলা করছিল। পাথর মেরে একটাকে বধ করতে দেরি হল না। মাছটার ওজন কমপক্ষে শ'দুই আড়াই গ্রাম না হয়ে যায় না।

প্রিয়বর্ধনের পদ্ধতিতে দু টুকরো শুকনো কাঠ ঘষে আগুন জ্বেলে মাছটা পুড়িয়ে রাক্ষসের মতো খেলুম বিচে বসে। তারপর পাহাড়ে চড়া শুরু হল। মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নেওয়াটা এভাবে কত জায়গায় কাজে লেগেছে বলার নয়। ঝর্ণার কাছ ঘেঁষে একটা চাতাল মতো জায়গা দেখতে পেলুম। সেখানে পৌঁছে প্রাণ ভরে জল খেয়ে দ্বীপের দিকে ঘুরে দাঁড়ালুম।

আগের দ্বীপটার চেয়ে এই দ্বীপটা বহুগুণে বড়। উঁচু থেকে ভূ প্রকৃতি ঠাহর হচ্ছিল। মাঝে মাঝে খোলা মাঠ, আবার ঘন জঙ্গল, টিলা পাহাড়, আবার বিস্তীর্ণ

সবুজ ঘাসের জমি। পাখির ঝাঁক চোখে পড়ছিল। এই তাহলে সেই আশ্চর্য দ্বীপ কিওটা।

এবার একটু ভাবনায় পড়ে গেলুম। আমি হয়তো চেষ্টা করলে জর্জ ব্যুগানভিলির মতো ভেলা তৈরি করে সমুদ্রে ভাসতে পারি—কোনো জাহাজ দৈবাৎ আমাকে দেখে উদ্ধার করলেও করতে পারে, নয়তো হাঙ্গরের পেটে হজম হয়ে যেতেও পারি। এই আশ্চর্য আবিষ্কার আমি লাগাতে পারবনা। আমি বিজ্ঞানী নই। কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মতো সাধারণ বিজ্ঞান সম্পর্কেও আমার তত বোধবুদ্ধি নেই। তাহলে এই আবিষ্কার মানুষের অতীত-কালের এক কিংবদন্তীকে পুষ্ট করা ছাড়া আর কী কাজে লাগবে ?

হতাশা পেয়ে বসল ক্রমশ। কর্নেলের কথা ভাবতে থাকলুম। ধুরন্ধর প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এখন কোথায় ? আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া নিয়ে হয়তো সূত্র ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে হন্যে হচ্ছেন রুবি দ্বীপে। কিওটা পৌঁছুনোর যত চেষ্টা করুন, দ্বিতীয় কাস্তিটার অভাবে পথ খুঁজে পাবেন না—এটা নিশ্চিত।

শুধু একটাই আশা। কর্নেল চিরদিন রহস্যময় অজানার সন্ধানে পাড়ি জমাতে পিছ পা হন নি। অসাধারণ তাঁর বুদ্ধির চাতুর্য। তাঁর মেধা তুলনাহীন।

ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কখন সেই চাতালে। ঘুম ভেঙে দেখি, বিকেল হয়ে গেছে। কী লম্বা ঘুম না ঘুমিয়েছি তাহলে। মাছটা দেখছি ক্ষিদে মেটাতে অদ্বিতীয়। কী মাছ কে জানে, মনে হচ্ছে ক্ষিদে জিনিসটা চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছে। শরীর ঝরঝরে লাগছে। স্ফূর্তিতে পেশী চনমন করছে। চাতাল বেয়ে সমুদ্রের বিচে নামতে থাকলুম। কেউ আমাকে দেখলে পাগল ভাবতে পারত। ফর্দাফাঁই পোশাক, খালি পা, রুক্ষ চিটচিটে চুল।

নিচে বড় বড় পাথরের টুকরোর ভেতর গাছপালা আর ঝোপ গজিয়ে রয়েছে। সেখানে যেই পৌঁছেছি, ডান দিকে জঙ্গলের ভেতর কেউ চেরা গলায় আর্তনাদ করে উঠল—'ও ডোণ্ট্ কিল্ মি!' তারপরই কেউ গর্জন করে বলল, 'মাণ্ট কিল ইউ ! কিল ইউ...কিল ইউ... এবং আর্তনাদের পর আর্তনাদ—'হেল্প ! হেল্প ! হেল্প !'

সারা বনভূমি পুড়ে 'কিল' এবং 'হেল্প' কথা দুটো জড়িয়ে যেতে যেতে প্রতিধ্বনিত হতে হতে ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তেজনায় আবার সেই উন্মাদনা আমাকে পেয়ে বসল। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দৌড়ুতে শুরু করলুম। লোকটাকে বাঁচানোর জন্য আমি মরীয়া।...

ক্রমশঃ

পিশেমশায়

আশা দেবী

টৈ-টম্বর চৌবাচ্চাতে
যেই নেমেছে হাবুলদা,
খানিকটা জল উপচে পড়ে
ছড়িয়ে গেল ঘর দুয়ারে
কুট্টিমামা কানটা ধরে
পাড়তে ছিল বেজায় গাল।
বৈজ্ঞানিক পিশেমশায়,
বললে হেসে : এমনটা হয়
জেনে রাখ এটা হল
আরকিমিডিস প্রিন্সিপাল॥

3 সি, পঞ্চাননতলা রোড,
গোলপার্ক, কলি-27

মহাকাশ গবেষণা

জগদীশ চৌধুরী

এই মুহূর্তে মহাকাশে এই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে বেশ কয়েক হাজার কৃত্রিক উপগ্রহ এবং মহাকাশ-যান। তাদের অধিকাংশই নির্মিত হয়েছে এবং মহাকাশে উৎক্ষেপিত হয়েছে পৃথিবীর দুটি শক্তিধর দেশ থেকে। কিন্তু কয়েকটি আছে অন্যান্য দেশের, অল্প কয়েকটি দেশের মাত্র, যার মধ্যে ভারতও আছে। বস্তুতপক্ষে, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতই সর্বপ্রথম এই কৃতিত্ব অর্জন করে।

মহাকাশ গবেষণা এবং মহাকাশে অভিযান বিশেষ ভাবে ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রশ্ন হতে পারে, পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করে এসবের প্রয়োজন আছে কি? বিশেষ করে ভারতের মত সমস্যা কণ্টকিত দেশের পক্ষে?

এর উত্তর এক কথায় দিতে হলে বলতেই হয়, এর অবশ্যই প্রয়োজন আছে। এজন্য এক দিকে যেমন অর্থ-ব্যয় আছে, অন্য দিকে তেমনি আছে অশেষ উপকার। সেই উপকার ও অবদানের কথা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা দেখতে পাব—আমাদের সার্বিক লাভের তুলনায় খরচাটা খুবই সামান্য মাত্র।

এই বিষয়টি নিয়ে এখানে সংক্ষেপে খানিকটা আলোচনা করে দেখা যাক। এই সমস্ত উপগ্রহ এবং মহাকাশযান আমাদের যে যে প্রয়োজনে আসে, তা হল:

1. আবহাওয়া বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাষে সাহায্য।
2. জলেস্থলে লুকানো সম্পদের সন্ধান করা।
3. দূর সংযোগ বা টেলিযোগাযোগে সাহায্য।
4. দূরদর্শনের সম্প্রচারে সম্প্রসারণ ঘটানো।
5. যানবাহন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।
6. পৃথিবী ও সৌরজগতের সমীক্ষা।
7. শত্রু দেশের উপর নজরদারী করা, খবরাদি সংগ্রহ করা; এবং
8. যুদ্ধের কাজে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ। যেমন পারমাণবিক বোমা সহ উপগ্রহ প্রেরণ প্রভৃতি।

এ সবের মধ্যে শেষের দুটি বিষয় সম্বন্ধে ভারত আদৌ আগ্রহী নয়। শান্তিপ্রিয় উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে সেটাই খুব স্বাভাবিক কথা।

কিন্তু আর কটি বিষয় যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতের পক্ষেও খুবই জরুরী, সে কথা বুঝিয়ে বলার সম্ভবত প্রয়োজন নেই।

আগে থেকেই যদি বিরাট ঘূর্ণীঝড় বা সাইক্লোনের পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে অনেক জীবন এবং ধন সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব।

আবার মাটি অথবা জলের নীচে লুকানো সম্পদ আমরা যত বেশি পরিমাণে খুঁজে বার করতে পারব, বলা বাহুল্য—ততই তো আমাদের সমৃদ্ধি বাড়বে।

আবার, উপগ্রহের সাহায্যেই মুহূর্তের মধ্যে এবং সরাসরি দূরবর্তী স্থানে ট্রাঙ্ক টেলিফোন করা সম্ভব হচ্ছে। অথবা টেলিপ্রিন্টারে খবর অথবা রেডিও-ফটো পাঠানো যাচ্ছে।

সারা ভারতে আছে সাড়ে পাঁচ লক্ষের উপরে গ্রাম। এগুলির সব কটিতে যদি টিভির সম্প্রসারণ ঘটাতে হয়, তাহলে ঐ উপগ্রহের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বস্তুত, সেটাই হবে সব চেয়ে সহজ এবং সস্তার ব্যবস্থা।

আর সৌরজগৎ এবং মহাবিশ্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিতে হলে তো অবশ্যই চাই এই সব মহাকাশযান। তারা সূর্য গ্রহ নক্ষত্র—এদের কাছে গিয়ে খবর পাঠাবে তাদের বিষয়ে, পাঠাবে মূল্যবান সব ছবি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজে মহাকাশ-যান ব্যবহার করা কেন? তাতে আমাদের কী লাভ? এ প্রশ্ন অবশ্যই করা যেতে পারে।

এ কথা ঠিক যে এই মুহূর্তে এই সব খবর বা তথ্য আমাদের প্রতক্ষভাবে কাজে না লাগতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই আমাদের অশেষ উপকারে আসার যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে। জ্ঞানের কোন শেষ নেই, সীমা নেই। আপাত অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান এক দিন অনেক লাভের উৎস হতে পারে। চাঁদ থেকে মূল্যবান খনিজ পদার্থ একদিন এই পৃথিবীতে আমদানী করার সম্ভাবনা অস্বীকার যদি কার, তবে সেটা হবে এক মারাত্মক ভুল। তারও পরবর্তী কালে বুধ, শুক্র, মঙ্গল থেকেও সম্পদ আমদানী করা হতে পারে। তা ছাড়া মহাকাশে নতুন শক্তির সন্ধান মিলবে না, তা-ই বা কে বলতে পারে? সদা বিরাজমান অনন্ত শক্তি, যা আমাদের সব সমস্যা মিটিয়ে দেবে।

অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে, যেদিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, আজকের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির দিনে এই মহাকাশ গবেষণা এবং অভিযান নিতান্তই অপরিহার্য।

বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আজ জীবন কল্পনাই করা যায় না। বিজ্ঞান বিহীন জীবন অচল, অন্ধকারময়।

সুতরাং ভারত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার এই বিশেষ দিকটির ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে, এবং এক্ষেত্রে তার সাফল্য উৎসাহব্যঞ্জক, সন্দেহ নেই।

এই সাফল্যের ফলশ্রুতি: আর্যভট্ট, ভাস্কর এবং রোহিণী সিরিজের উপগ্রহ সমূহ, অ্যাপেল, ইনস্যাট সিরিজ প্রভৃতি। আর, এইভাবে অনেক সাফল্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবং আমাদের তিন-রঙ্গা জাতীয় পতাকা বহন করে একের পর এক আরও অনেক উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপিত হবে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সাফল্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবং সেই সঙ্গে বাড়বে ভারতের খ্যাতি ও মর্যাদা।

Q/4 সাহাপুর হাউসিং এস্টেট কলি-700 038

বইমেলা ত্রিপুরায়

হান্নান আহসান

বইমেলা। দিন এগোচ্ছে, মেলার সংখ্যা বাড়ছে। এক বছরে তিন তিনটে মেলা, খোদ কলকাতায়। ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, পাঠক-ক্রেতা সাধারণের কাছে বইমেলার আকর্ষণ বেড়েছে কতখানি। 19—28 জানুয়ারী, দশ দিনের কলকাতার মত জমজমাট না হলেও বইমেলার আসর বসেছিল ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর আগরতলায়। মিঠে-কড়া হিমেল হাওয়া কিংবা শীতের ঝলমলে দুপুর নয়, বেশ কনকনে ঠাণ্ডা মাথায় করে তথ্য-সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর ত্রিপুরা সরকার আয়োজিত বইমেলায় টাকা পিছু দশ পয়সা ভরতুকি দেওয়া ছাড়া অন্য কোন বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যায়নি। বরং মাসের শেষ আর বছরের শুরুতে নতুন ক্লাসে ওঠা ছেলেমেয়েদের হাত থেকে বইয়ের তালিকা পেয়ে মা-বাবা যতখানি না চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন, মেলার উদ্যোক্তাদের চোখে-মুখে ব্যস্ততার ছাপ ততখানি ছিল না। যাইহোক মেলা শেষ হয়েছে। কলকাতার প্রকাশক কিংবা বইয়ের ব্যবসায়ীদের বিশেষ কিছু ক্ষতি না হলেও বাতাসে ভেসে যাওয়া-আসার আমেজটুকু উপভোগ করেছেন—এই যা।

ছোট শহর আগরতলা। দু' আড়াই ঘণ্টায় পায়ে পায়ে ঘুরে আসা যায়। কলকাতার মতন গিজগিজ লোকজন নেই। সংখ্যায় নিতান্ত অল্প। ত্রিপুরী, মণিপুরী, চাকমা, লুসাই, রিয়াং, কলুই, খাসিয়া এইরকম অনেক উপজাতির বাস এখানে। মেলা প্রাঙ্গণে আগরতলা রবীন্দ্রভবন লাগোয়া তারা এসেছেন। বাচ্চা ছেলে-মেয়েরাও এসেছে। কেউ চাদর গায়ে, সোয়েটার কিংবা কারো কারো মাথায় টুপী, জ্যাকেট প্রভৃতি শীতের পোষাকে মেলায় ভীড় জমেছে। ভীষণ ঠাণ্ডা। রাত্তির সাতটা না বাজতে বাজতে মেলার মাঠে থাঁ থাঁ নেমে এসেছে।

গোটা চল্লিশেক স্টল এসেছিল এবারের চতুর্থ বইমেলায়। বেশীর ভাগই স্টল কলকাতার প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের। আগরতলার স্টলগুলোতে হযবরল বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয় প্রকাশক হওয়ার চেয়ে পুস্তক বিক্রেতা হবার শখ বেশী এখানকার মানুষদের। জনা দুয়েক প্রকাশক এখন পর্যন্ত বই প্রকাশ করেছেন। সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য। নতুন দৃষ্টি ভংগী আর অক্লান্ত পরিশ্রমের সাথে এগিয়ে আসছেন অবলা প্রকাশনী। তাদের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খান দশ। বই প্রকাশ করা ছাড়া নিজেদের দু'টি মাসিক পত্রিকা রয়েছে। নিয়মিত বেরুচ্ছে ত্রিপুরার একমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক কাগজ 'জ্ঞান-বিচিত্রা'। 'সমতল' সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগে লড়াই করছে।

মেলায় দশ লক্ষ টাকার ওপরে বই বিক্রি হয়েছে। বিগত বছরগুলোর তুলনায় এই বিক্রি মন্দ। কলকাতার নামী-দামী প্রকাশকরা এবারে তাদের আশা পূরণ করে ঘরে ফিরতে পারেন নি। মেলায় শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের চাহিদা ছিল আকাশ ছোঁয়া। আগরতলার উৎসুক ক্রেতা সাধারণ এখনো রামকৃষ্ণ কথামৃত আগ্রহ সহকারে কিনেছেন। স্থানীয় কবি, ছড়াকার, সাহিত্যিকদের আড্ডা জমে উঠেছিল প্রতিদিন সন্ধ্যায় জ্ঞান-বিচিত্রার স্টলে।

মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী শেষ দিন স্টল ঘুরেছেন, দেখেছেন। স্টল মালিকদের সাথে আলাপ করেছেন। কোন প্রকাশকের কি কি বই বেশী বিক্রি হচ্ছে তা জানতে চেয়েছেন। ভাল লাগার মত ব্যাপার। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেলা প্রাঙ্গনের রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে মহকুমা যাত্রা পার্টিদের দিয়ে যাত্রাগান পরিবেশনের স্বপক্ষে কতটা যুক্তি থাকতে পারে তা ভাববার বিষয়।

প্রযত্নে ঃ আশীষ ভারতী (ডাক কর্মী), বারুইপুর, ২৪ পরগণা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত

রচনা প্রতিযোগিতা

মান : নবম ও দশম শ্রেণী

প্রথম পুরস্কার 40টা. দ্বিতীয় 30টা. তৃতীয় 20টা.

বিষয় সূচী

প্রবাসে ভারতীয় বিজ্ঞানী—শব্দ সংখ্যা 400

নিয়মাবলী

* মার্জিনসহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে রচনা লিখে পাঠাতে হবে।

* নীচের কুপনটি পূরণ করে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

* প্রেরিত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না।

পুরস্কৃত রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ 30 এপ্রিল 1984।

প্রতিযোগীর নাম .....বয়স.....

ঠিকানা .....

বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা.....

শ্রেণী..... .....রচনা বিষয় .....

প্রতিযোগীর স্বাক্ষর .....

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর.....

মান : ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী

প্রথম পুরস্কার 30টা. দ্বিতীয় 25টা. তৃতীয় 20টা.

বিষয় সূচী

বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার—শব্দ সংখ্যা 400

নিয়মাবলী

* মার্জিনসহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে রচনা লিখে পাঠাতে হবে।

* নীচের কুপনটি পূরণ করে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

* প্রেরিত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না।

পুরস্কৃত রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ 30 এপ্রিল 1984।

প্রতিযোগীর নাম..... বয়স.....

ঠিকানা.....

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা

শ্রেণী.....রচনার বিষয়.....

প্রতিযোগীর স্বাক্ষর .....

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষার

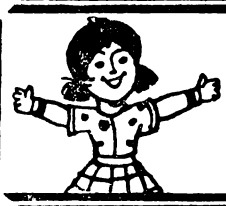

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

'নলেজ ক্যুইজ' ফেব্রুয়ারী 84 সংখ্যার উত্তরদাতাদের নাম

সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর যারা দিতে পেরেছে—

পারমিতা রায়, সুস্মিতা দাস চাকদহ, নদীয়া। সুস্মিতা বসু, শ্রদ্ধা বসু, দীপক বসু, শৌভিক নন্দ, রাজেশ মুখার্জী।

কলকাতা ঃ

প্রবীর দে, প্রসেনজিৎ দাস, প্রবীর চক্রবর্ত্তী, অচিন চক্রবর্তী, মৃদুল চক্রবর্তী, আবিরা চক্রবর্তী, দোলা চক্রবর্তী, মিহির আচার্য, ধ্রুবকুমার দে, শুভজিত চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য শৈবাল নন্দী, প্রবাল নন্দী, জ্ঞানপ্রকাশ মজুমদার, দিব্যেন্দু ও শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী, তনিন্দ ব্যানার্জী, অঞ্জন সাহা।

24-পরগণা ঃ

কুঁড়ি মজুমদার, শান্তনু ভট্টাচার্য্য, দিপুকুমার মিস্ত্রী, আশুতোষ মণ্ডল, তমাল ঘটক, অনুকূল চন্দ্র পাল, নিরঞ্জন রায়, পথিক মণ্ডল, দেবাশিষ ঘোষ, শেখ মনিরুল ইসলাম।

হাওড়া ঃ

নিমাই সাউ, অসিত রীত, কাজলরাণী রীত, তাপস রীত, মানসী রীত, শান্তনু কাঁড়ার, সন্দীপ দাস, হারুকুমার দাস, সমর সামন্ত।

হুগলী ঃ

শুভ্রা মোদক, মিনতি মোদক, সুপ্রিয় মোদক, ভাস্কর ঘোষ, পার্থ কুণ্ডু, অভিজিৎ দত্ত, মনজিৎ দত্ত, অমিত মুখার্জী, দীপঙ্কর সাহা, যমুনা শীল, অনুসীমা শীল, আলপনা থাঁ, সুব্রত মোদক, রবীন মুখার্জী, তপন ভট্টাচার্য্য।

বীরভূম ঃ

পার্থ প্রতিম দত্ত, বুদ্ধদেব সরদার, সুমন্ত দত্ত, সুদীপ দত্ত, সরোজ দাস, সুমিতা ঘোষ, দীপনারায়ণ দত্ত, সুনীত মণ্ডল, বিদ্যুৎকুমার রায়, প্রদ্যুৎকুমার রায়, দ'পেন্দ্র মজুমদার, ত্রিদিব লাই, দীপক পাল, জগন্নাথ দাস, বিদুৎ সাহা, আসিক মেহেবুব।

বর্ধমান ঃ

দীপঙ্কর সিংহ, পার্থসারথি মণ্ডল, সোমেশ্বর ঘোষ চৌধুরী, অরূপ মল্লিক, নিমাইচন্দ্র রায়, পিকলু গাঙ্গুলী, কৃষ্ণগোপাল সেন, দেবজ্যোতি পানি, সুপ্রিয়া চ্যাটার্জী, সুমিতা চ্যাটার্জী, সুবিমল ভট্টাচার্য, সুমিত ভট্টাচার্য, সুমন চক্রবর্তী, সুধাময় চক্রবর্তী, কৌশিক আচার্য্য, উত্তম ব্যানার্জী, ফওজুল কবীর, ভাস্কর মজুমদার, সমীরকুমার চৌধুরী, অভিজিৎ মণ্ডল, জয়ন্ত ঘোষ, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। পারমিতা সরকার, মাণিকচাঁদ মারোঠি, অনিমেশ মুখার্জী।

মেদিনীপুর ঃ

ইন্দ্রজিৎ সান্যাল, সর্বাণী ষড়ঙ্গী, দেবজ্যোতি ষড়ঙ্গী, সুমন মুখোপাধ্যায়, সুমন সিংহ, প্রদীপ সরখেল, মল্লিকা রায়, অসিত কানদার, স্বপন চক্রবর্তী, দেবকুমার রাণা, নিবেদিতা প্রামাণিক।

নদীয়া ঃ

কৌশিককিরণ ঘোষ, বাপি সরকার, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, সঞ্জয় প্রামাণিক, শান্ত চক্রবর্তী পার্থপ্রতিম বসু, সঞ্জয় বসু, ইন্দ্রাণী রায়।

মুর্শিদাবাদ ঃ

জয়দীপ ব্যানার্জী, মলয়শঙ্কর চৌধুরী, সোমেন মজুমদার, সুলতান চৌধুরী, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়।

মালদহ ঃ

চিন্ময় দাস, তন্ময় দাস।

কোচবিহার ঃ

অর্পিতা ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর চৌধুরী, প্রবীর চক্রবর্তী, দীপঙ্কর মুখার্জী, পার্থসারথি দত্তমণ্ডল।

বাঁকুড়া ঃ

শ্যামসুন্দর সাহা, নীলিমা সাহা, সুখেন দাস, শুভাশিস দাস, দেবাশিস দাস, শ্যামল দাস, পাপিয়া বাজপেয়ী, কৃষ্ণ-গোপাল দাস, তনয় দাস, মদনগোপাল গোস্বামী।

পুরুলিয়া ঃ

নিলয় দত্ত, জয়দেব মাহাতো।

জলপাইগুড়ি ঃ

শঙ্খশ্রী ব্যানার্জী।

বিহার-ধানবাদ ঃ

নীনা, বুকান, বাবাই।

আসাম—ডিব্রুগড় ঃ

তরুণ সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ, কৃষ্ণা দেবনাথ, সুরেশচন্দ্র দাস। জয়দীপ নন্দী, কাবেরী ভট্টাচার্য, ভাস্কর চৌধুরী, স্বস্তিকা ভট্টাচার্য।

পঃ দিনাজপুর ঃ

প্রদীপকুমার ঘোষ, শান্তনু দাস।

নাগাল্যান্ড ঃ ডিমাপুর—সুদীপ্ত দে সরকার।

নলেজ ক্যুইজ

1. 'ক্রে-পিজিয়ন' কথাটি কোন্ খেলায় ব্যবহৃত হয় ?
2. 'দান সাগর' গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?
3. পরমাণুর মৌলিকত্ব কিসের উপর নির্ভর করে ?
4. কোন্ ভিটামিন ক্ষত নিরাময় প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে ?
5. ঘানার আগেকার নাম কি ছিল ?
6. গুরু নানকের জন্ম হয় কোথায় ?
7. ভারতের কোন্ রাজ্যে 'গিড্ডা' নাচ প্রচলিত আছে ?
8. কোন্ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম Camellia Sinensis ?
9. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
10. 'ক্যাথে প্যাসিফিক' কি ?
11. 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটি কার লেখা ?
12. উষ্ণমণ্ডলীয় তৃণভূমির নাম কি ?
13. কোন্ দেশকে 'শ্বেত হস্তীর দেশ' বলা হয় ?
14. 'হানিবল' কোন্ দেশের লোক ছিলেন ?
15. হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কার করেন কে ?

(গত সংখ্যার নলেজ ক্যুইজ-এর সমাধান)

-1. 1954 খ্রীষ্টাব্দে 2. ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ 3. 1986 খ্রীষ্টাব্দে 4. বলবীর সিং 5. Mallet 6. চার্নকাইট 7. ফরাসী 8. কুতবুদ্দীন আইবক 9. তামিলনাড়ু 10. কৃষ্ণকায় লোমশ তিব্বতীয় ষাঁড় 11. কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরী পর্বত থেকে 12. 70।

ফেব্রুয়ারী সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

কে	কু	লে	■	প্র	টি	স্টা
■	ন	■	ভা	বা	■	র
রি	■	প্যা	স্ক	ল	■	না
কে	প	লা	র	■	হি	ম
ট	■	ডি	■	জে	ট	■
■	মো	য়া	রি	ন	■	মু
স্ট্যা	না	ম	■	ন	স্ক	ত্র

সংখ্যাকূট

জয়জিৎ লাহিড়ী

1	2		■	4	5	7
3		■	■	■	6	
	■	15		16	■	
■	■		■		■	■
■	■		■		■	■
8	■	17			■	12
9	10	■	■	■	13	
11			■	14		

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ—

1. ফ্রান্সিয়মের পারমাণবিক গুরুত্ব। (চিহ্ন = Fr)। 3. আমাদের চোখের পাতা গড়ে মিনিটে যতবার ওঠা নামা করে। 4. পারদের স্ফুটনাঙ্ক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। (চিহ্ন = Hg)। 6. অ্যান্টিমনির পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক। (চিহ্ন = Sb)। 9. তুলার ক্রোমোজম সংখ্যা (2n সংখ্যক)। 11. টিনের গলনাঙ্ক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। (চিহ্ন = Sn)। 13. ক্যারট মাপে বিশুদ্ধ সোনার মান। 14. সি. জি. এস পদ্ধতিতে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান যত সেঃ মিঃ/সেকেণ্ড^2। 15. বৈজ্ঞানিক ডেনিস প্যাপিন যত সালে মারা যান। 17. ক্যালসিয়ামের স্ফুটনাঙ্ক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। (চিহ্ন = ca)।

উপর-নীচ ঃ

1. রেডনের পারমাণবিক গুরুত্ব। (চিহ্ন = Rn)। 2. ফেব্রুয়ারী মাসের দিন সংখ্যা। (লিপ্-ইয়ার ব্যাতিত)। 5. সিজিয়মের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক। (চিহ্ন = cs)। 7. বেরিয়ামের গলাঙ্ক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। (চিহ্ন = Ba)। 8. ব্রিটিশ তাপ একক = কত ক্যালরি। 10. মানুষের ক্রোমোজম সংখ্যা (n সংখ্যক)। 12. প্রসিওডিসিয়ম-এর পারমাণবিক গুরুত্ব। (চিহ্ন = pr)। 13. নিকেলের ইলেকট্রন সংখ্যা। (চিহ্ন = Ni)। 15. স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যত সালে জন্ম গ্রহণ করেন। 16. বোরোনের স্ফুটনাঙ্ক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। (চিহ্ন = B)।

C/o বিকাশ চন্দ্র রায়, রায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি

প্রশ্নোত্তর

উত্তর দিয়েছেন : অজয় চক্রবর্তী

প্রশ্ন : আকাশে একটি ঢিল ছুঁড়ে দিলে তা মাটিতে নেমে আসে, কিন্তু অনেক ভারী হয়েও এরোপ্লেন আকাশে ভাসে কেন ?

(জয়কুমার দে, মিস্ত্রীপাড়া, বর্ধমান)

উত্তর : এক খণ্ড পাথর বা অন্য কোন বস্তুকে আকাশে ছুঁড়ে দিলে অভিকর্ষের টানে তা নিচে পড়ে। কেননা, এক্ষেত্রে অভিকর্ষ বলকে প্রতিমিত করার মতো অন্য কোন বল ক্রিয়া করে না। কিন্তু এরোপ্লেন যখন বায়ুর মধ্য দিয়ে আকাশে ওড়ে তখন ডানার উপর বায়ু যে-বল প্রয়োগ করে তার উল্লম্ব-উপাংশ অভিকর্ষ বলকে নাকচ করে দেয়। ফলে এরোপ্লেন আকাশে ভাসতে পারে।

প্রশ্ন : 40 W ল্যাম্পের চেয়ে 100 W ল্যাম্প বেশি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে কেন ?

(জয়কুমার দে, মিস্ত্রীপাড়া, বর্ধমান)

উত্তর : 40 W ল্যাম্পে প্রতি সেকেণ্ডে 40 জুল বিদ্যুৎশক্তি তাপ ও আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, আর 100 W বাল্‌বে প্রতি সেকেণ্ডে 100 জুল বিদ্যুৎশক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। 100 W বাল্‌বে শক্তির রূপান্তরের হার বেশি বলে এ ল্যাম্প থেকে বেশি আলো পাওয়া যায়।

প্রশ্ন : মসৃণ মেঝে বা কাঁচের ওপর পেন্সিল বা চকের দাগ পড়ে না কেন ?

(কৃষ্ণ ও সুধা, আসানসোল)

উত্তর : অমসৃণ মেঝে বা ঘষা কাঁচে বহু সূক্ষ্ম খাঁজ থাকে। এরূপ মসৃণ তলের ওপর দিয়ে পেন্সিল বা চক ঘষলে পেন্সিলের শীষের বা চকের গুঁড়ো সহজেই ঐ সব খাঁজের মধ্যে ঢুকে যায়। ফলে অমসৃণ মেঝে বা ঘষা কাঁচের ওপর চক বা পেন্সিলের দাগ পড়ে। মসৃণ মেঝে কিংবা কাঁচে খাঁজ থাকে না বলে এদের ওপর পেন্সিল বা চকের দাগ পড়ে না।

প্রশ্ন : আমরা জানি যে, পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন এবং নিউট্রনের তড়িদাধান বিনিময় হয় এবং প্রোটন নিউটনে এবং নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্তিত হয়। এ কার্য সম্পাদন করে মেসন কণা। এই কণা কি ভরবিশিষ্ট নাকি ভরশূন্য ? এই কণা কি তড়িদাধানবিশিষ্ট, নাকি তড়িদাধানশূন্য ?

(দীপ্তি রায়, দুর্গাপুর)

উত্তর : নিউক্লীয় বলের জন্য দায়ী নিউক্লিয়নগুলোর মধ্যে π-মেসন কণা বিনিময়। π-মেসন কণা ভরবিশিষ্ট। π-মেসন কণায় ধনাত্মক তড়িদাধানও থাকিতে পারে, ঋণাত্মক আধানও থাকিতে পারে। আবার এরা তড়িদাধান-শূন্যও হতে পারে।

প্রশ্ন : আকাশে তো কিছু নেই। তাহলে আকাশের রঙ নীল কেন ?

(দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত, কলিকাতা)

উত্তর : আকাশে কিছুই নেই একথা ঠিক নয়। পৃথিবীর বেশ খানিকটা উপর পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল আছে। বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান বিভিন্ন গ্যাসের অণুর উপর সূর্যের আলো পড়লে ঐ আলোর বিক্ষেপণ (scattering) ঘটে। বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে দেখিয়েছেন যে, এই বিক্ষেপনের ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত আলোর পরিমাণ ($1/\text{এ}^4$)-এর সমানুপাতিক (এ = আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য)। বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (4/7) গুণ বলে লাল আলোর বিক্ষেপনের চেয়ে বেগুনি আলোর বিক্ষেপণ $(7/4)^4$ বা প্রায় 10 গুণ বেশি হবে। একইভাবে, লাল আলোর চেয়ে নীল আলোর বিক্ষেপণ 7 গুণ বেশি হবে। সূর্য থেকে দূরে আকাশের কোন অংশের দিকে তাকালে ঐ অংশ থেকে আমাদের চোখে যে-আলো এসে প্রবেশ করে তাতে বেগুনি ও নীল রঙের পরিমাণ অন্যান্য আলোর তুলনায় বেশি থাকে। এর ফলে আকাশকে নীল দেখায়।

ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

জেনে রাখ

ভিন্ন ধরণ বিশ্বাস

দুগ্ধ পদপ

উত্তর আমেরিকার এক রকম গাছ এই দুগ্ধ পদপ। এই গাছের গায়ে ছিদ্র করলে সাদা দুধের মত এক প্রকার তরল জিনিস পড়তে থাকে এর স্বাদ অনেকটা ঠিক দুধের মত। একে 'গো-পদপ'ও বলে। এই গাছের ছাল থেকে এক রকম সুমিষ্ট রুটি তৈরী হয়।

বর্ষণ বৃক্ষ

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশে এক রকম উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। প্রখর রৌদ্রের সময় থেকে বৃষ্টির মত জল পড়তে থাকে, এই জল কিন্তু খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।

সবচেয়ে ছোট স্তন্যপায়ী

সবচেয়ে ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী হচ্ছে 'শ্রু' ইহাদের দেখতে ইঁদুরের মত কিন্তু ইঁদুর জাতীয় নয়। এরা স্থলচর।

28, বহিলাপাড়া, পোঃ বর্দ্ধমান।

গাছেরাও কি চিন্তা করে ?

তাপস কান্তি হালদার

গাছপালা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় প্রাণীদের ন্যায় গাছপালা এবং লতানো উদ্ভিদেরাও সম্ভবতঃ চিন্তাশীল। কয়েকটি সংজ্ঞা দিলেই ধারণাটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন ধরা যাক ফার্ণ নামক লতানো উদ্ভিদ। যেগুলো আজ ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বাড়ির চারপাশে দেখা যায়। যে গুলো আমরা সাধারণতঃ ঘাস জাতীয় বলে ভাবি। কিন্তু আদিম যুগে এই ফার্ণ গাছই ছিল অতিকায় লম্বা তাল বা নারকেল গাছের মত। তখনকার দিনের প্রাণীরাও ছিল অতিকায়। এই সব অতিকায় প্রাণীদের অধিকাংশই ছিল তৃণভোজী। যেমন, স্টিগোসরস, ডাইপ্লোডোকাস প্রভৃতি। এরা তখন ঝোপ জঙ্গল অর্থাৎ ছোট ছোট উদ্ভিদ বাদ দিয়ে এই সমস্ত অতিকায় গাছদের খেতে লাগল। ফলে তাদের বংশ কমতে লাগল। ফলে তারা চিন্তা করল যে আমাদেরও পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে। তখন তাদের পরবর্ত্তী বংশধররা মাটি থেকে কম খাবার সংগ্রহ করতে লাগল এবং না খাওয়ার ফলে তাদের বৃদ্ধিও কম হতে লাগল ফলে আস্তে আস্তে বিবর্তণের ফলে তাদের পরবর্তী বংশ-ধরদের আকৃতি ছোট হতে লাগল এবং বর্ত্তমান রূপ নিয়ে জন্মালো। ফার্ণ গাছগুলি কেবলমাত্র ফুলের তোড়া বাঁধতে কাজে লাগে। মানুষের মত চিন্তা না থাকলে ঐ ফার্ণ গাছ বোধহয় আজ আমরা দেখতে পেতাম না।

আমরা জানি এক ফুলের রেণুর সংগে অন্য ফুলের সংযোগ ঘটলে ফলের উৎপন্ন হয় এবং ঐ ফল থেকে ক্রমে বীজ এবং আর একটি নতুন গাছের জন্ম হয়। আদিম যুগে সর্ব প্রথম উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়েছিল বলে সারা পৃথিবীর স্থল ভাগ ছিল ঘন জঙ্গলে পূর্ণ এবং ঐ সমস্ত ফুলের পরাগ-যোগ সুইস্থায় বায়ুপ্রবাহে আন্দোলন হতে লাগল। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এবং জীব জন্তু আবির্ভাবের পর জীবজন্তু কর্তৃক গাছপালার সংখ্যা কমতে লাগল তখন আবার তারা বংশ বিস্তার সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল। তখন তাদের ফলগুলো সব সুগন্ধযুক্ত এবং নানা রংয়ের সমাহারে গজিয়ে উঠল। এবং বিভিন্ন কীটপতঙ্গের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার ফলে তাদের পরাগ সংযোগের পথ সহজ হয়ে গেল। উদ্ভিদের যদি চিন্তা না থাকত তাহলে হয়তো আমরা আজ ঐ সমস্ত মনোরম গন্ধ সুন্দর ফুল গাছ দিয়ে আমাদের বাগান সাজাতে পারতাম না !

কিছু কিছু গাছের ফলগুলো হতে লাগল সুস্বাদু. মনোরম, লোভনীয়। যেমন আম বা নারকেল গাছ প্রভৃতি। এ গুলো খেতে খুবই সুন্দর এমন কি কচি ডাব রোগীর পথ্য হিসাবেও ব্যাবহার করা হয়। সেজন্য আমরা ভাল জাতের আম বা নারকেল গাছ বাড়ীতে বা জমিতে লাগাই। এইভাবে তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল। আদিম যুগের গাছপালার স্বাধীন চিন্তাই এর কারন।

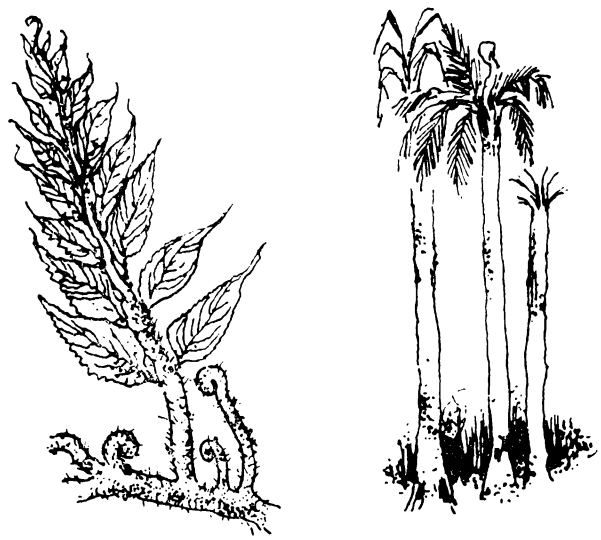

বাম দিক থেকে—ফার্ণ গাছ ও আদিম যুগের ফার্ণ গাছ

আবার দেখা যায় কিছু কিছু গাছ বংশ রক্ষার জন্য চিন্তা করে অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীর আকার নিল, যাকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলি অনুকৃতি বা মিমিক্রি যেমন সর্প-গন্ধা। হিমালয়ের পাদদেশে পাওয়া যায় সাপের মত দেখতে। কোন কোন গাছ চিন্তা করে তাদের গায়ে এক রকম রোঁয়া তৈরী করল যাতে বিষাক্ত অ্যাসিড থাকে। তৃণভোজী প্রাণীরা এই সব গাছের ধারে কাছে ঘেঁসে না। যেমন, বিছুটি পাতায় কার্বলিক অ্যাসিড যাতে হাত দিলে জ্বালা করে। তেমনি আর অন্য উদ্ভিদেরাও চিন্তা করে তাদের গায়ে বড় বড় কাঁটার উৎপন্ন করল। কেউ কেউ নিজেদের গায়ে বিষাক্ত প্রাণীদের জায়গা দিল যাতে প্রাণীরা সেই সমস্ত গাছের ক্ষতি না করতে পারে। যেমন, ফণিমনসা গাছের পাতার কাঁটায় রূপান্তর এবং আম বা জাম গাছ লাল পিঁপড়েদের থাকতে দেয় এবং জিউলী নামক এক প্রকার গাছের কাণ্ডে শুয়োপোকাদের থাকতে দিয়ে প্রাণীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে। এই ভাবে বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় গাছেরাও চিন্তা করে।

11নং মহাজাতি স্কুল রোড, নলতা (বড় বাড়ি) কলি-24

মজার ম্যাজিক

দেবাশীষ পাল

দুটি চুম্বক সমমেরুকে বিকর্ষণ ও অসম মেরুকে আকর্ষণ করে। চুম্বকের এই ধর্মটি তোমরা নিজেরাই দুটি চুম্বক নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

চুম্বকের এই বিশেষ ধর্মটিকে কাজে লাগিয়ে আজ তোমাদের আমি এক মজার ম্যাজিক খেলা শেখাব, তবে ম্যাজিক শেখাবার আগে তোমাদের দুটি খেলনা তৈরী করতে হবে যাঁর সাহায্যে তোমরা এই ম্যাজিকটি দেখাবে।

খেলনা দুটি তৈরী করতে খুব বেশী জিনিষের প্রয়োজন হয় না। আমি নীচে একে একে উপকরণ, তৈরীর পদ্ধতি, দেখাবার পদ্ধতি বর্ণনা করছি :

উপকরণ : 1. একটি চুম্বক দণ্ড

2. দুটি দিয়াশালাইয়ের খালি বাক্স
3. একটি ছোট প্লাস্টিকের বাটি (যাহা স্বচ্ছ নয়)
4. একটি চুম্বক শলাকা
5. বর্ণাকৃতি একটি ড্রইং শীট
6. ছোট রাম ও রাবনের দুটি ফোটো
7. একটি ছোট পাতলা প্লাস্টিকের পুতুলের উপরের অর্ধাংশ (যাহা শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা বলিয়া মনে করা যায়।)
8. আঁঠা 9. কাঁচি 10. বাটির ব্যাসার্দ্ধের সমান ছোট কাচের চাকলি।

তৈরীর পদ্ধতি : ক'-চিত্র অনুযায়ী (1) নং দিয়াশালাইয়ের বাক্সে দণ্ড চুম্বকটি ঢোকাও যেন উহা বাক্সের মধ্যে আঁট সাট হয়ে ভাল মতন বসে থাকে। এবার (2) নং দিয়াশালাইয়ের বাক্সটিকে (1) নং বাক্সের উপর খাড়া করে আঁঠা দিয়ে ভাল মতন লাগিয়ে দাও। এখন (1) নং ও (2) নং বাক্সটিকে ভাল কাগজ দিয়ে সুন্দর মতন আঁঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও যেন এগুলি দিয়াশালাইয়ের বাক্স বলে মনে না হয়। এর পর দাঁড়ান বাক্সটির যে পাশে উত্তর মেরুর দিক পড়েছে সেই পার্শে রামের ছবি লাগাও ও অপর পার্শে রাবণের ছবি লাগাও।

এবার খ-চিত্রের মতন একটি ছোট প্লাস্টিকের বাটি নাও। (যাহার মধ্য দিয়ে দেখা যায় না, অর্থাৎ স্বচ্ছ নয়)। এই বাটির মাঝখানে চুম্বক শলাকাটি বসাও এবং ভাল মতন লাগিয়ে দাও দেখবে চুম্বক-শলাকাটির ষ্ট্যাণ্ডটি যেন বাটির উচ্চতা থেকে কিছুটা ছোট হয়। এবার ড্রইং শীটের কাগজটিকে বাটির ব্যাসার্দ্ধের কম ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে একটি গোলাকার চাকতি কাট। এই চাকতিটিকে এবার চুম্বকের উপর বসাও এবং ভাল মতন লাগিয়ে দাও। দেখবে যেন চুম্বকটি সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। এবার চিত্রের মতন পুতুলের অর্ধাংশটিকে চাকতির ঠিক মাঝখানে বসাও। পুতুলটিকে এমনভাবে বসাবে যেন তার সামনের দিক চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর দিক থাকে ও পিছনের দিক উত্তর মেরুর দিকে থাকে। এবার খ-চিত্রের সমস্ত জিনিসটাকে একটি কাচের স্বচ্ছ ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দাও।

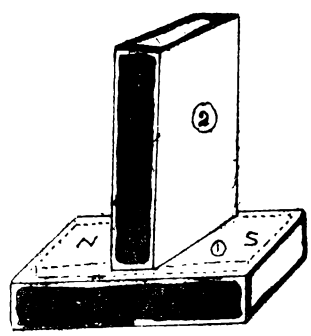

চিত্র-ক

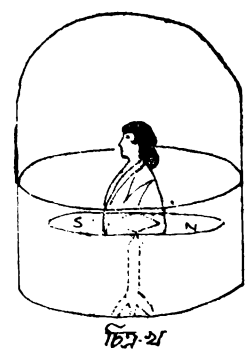

চিত্র-খ

সর্বদা মনে রাখবে 'ক' ও 'খ' চিত্রের জিনিষ দুইটিতে যে চুম্বক ব্যবহার করা হয়েছে তা যেন বাহির হইতে দেখা না যায়। অর্থাৎ লোকে যেন বুঝতে না পারে যে তুমি চুম্বক ব্যবহার করেছ। দেখাবার পদ্ধতিঃ এবার 'ক' চিত্রের জিনিষটিতে যে দিকে রাবনের মুখ আছে সেই দিকটা 'খ' চিত্রের সীতার মুখের কাছে নিয়ে যাও তাহলে দেখবে যে সীতার মুখ পিছন দিকে মুড়ে গেল অর্থাৎ সীতা রাবনের মুখ দেখতে চাহেন না। তাই তিনি অন্য দিকে মুড়িয়া গেলেন। কিন্তু এবার যদি তুমি রাবণের মুখ সরিয়ে রামের মুখ দেখাও তবে দেখবে যে সীতা রামের দিকে তাকিয়ে আছে। রাবণকে দেখার মতন আর মুখ মুড়িয়ে নিচ্ছে না। সবাই এই ব্যাপার দেখে মনে করবে যে বুঝি যাদুমন্তর দিয়ে এই সব ঘটনা ঘটছে। কিন্তু ঘটনাটা তাই নয়। তুমি কাজে লাগিয়েছ চুম্বকের সেই বিশেষ ধর্মটিকে—

সমমেরুকে বিকর্ষণ ও অসমমেরুকে আকর্ষণ।

চেনিডাঙ্গা, আসানসোল, বর্ধমান

ভেবে ভেবে বল • চন্দন রুদ্র

1. ক) একটি লেন্সের মাঝখানে মোটা, পাশে পাতলা ; (খ) আর একটি লেন্সের মাঝখানে পাতলা, পাশে মোটা—কোনটিকে কি বলে ভেবে বল।

2. ফসফরাসকে বায়ুতে পোড়ালে এক ধরনের সাদা ধোঁয়া হয় ঐ ধোঁয়াকে কি বলে বল।

3. নিচের ছবি দুটি [ক-খ] কিসের বলতে পার ?

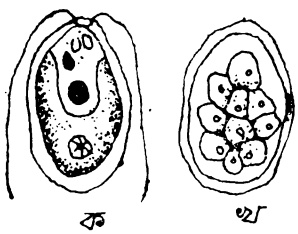

ক খ

4. কোন পেশীর সঙ্কোচনে আমাদের অঙ্গ সঞ্চালন ও গমন ঘটে ?

5. আমাদের দেহের আলোক-সচেতন অংশ হল—(ক) কর্কলিয়া, (খ) কণীনিকা, (গ) অক্ষিপট, কোনটি ঠিক ভেবে বল।

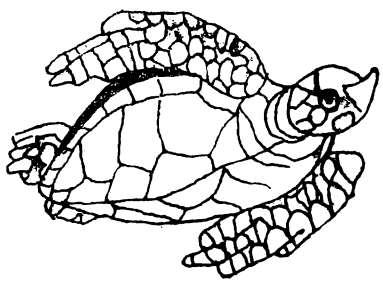

6. উপরে একটি সামুদ্রিক প্রাণীর ছবি রয়েছে, প্রাণীটির নাম জান কি ?

7. শরীরে শ্বেত রক্ত কণিকা অধিক পরিমাণে হলে (ক) অ্যানিমিয়া, (খ) লিউকেমিয়া রোগ দেখা দেয়। —কোনটি ঠিক বল।

8. যে সকল প্রাণী দু'পায়ে ভর করে চলে তাদের কি বলে ভেবে বল।

ভেবে ভেবে বল'র সমাধান

1. ক) উত্তল লেন্স, (খ) অবতল লেন্স, 2. ফসফরাস পেণ্টক্সাইড, 3. এককোষী প্রাণী ক্লামাইডোমোনাসের [Chlamydomonus] জনন ক্রিয়ার ছবি, 4. কঙ্কাল পেশী, 5. কণীনিকা, 6. Parrot bill turtle. সামুদ্রিক কচ্ছপ, 7. লিউকেমিয়া রোগ দেখা দেয়, 8. বাইপেড বলে।

বাঁশদ্রোণী পেয়ারা বাগান, পোঃ বাঁশদ্রোণী, 24 পরগনা।

রেডিয়াম ঘড়ির অপকারিতা

সত্যজিৎ সেন

রাত্রিবেলা দেখার সুবিধার জন্য রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির কথা আমরা শুনে থাকি। এখন, এই রেডিয়াম অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে, এর ব্যবহার ক্রমেই কমে আসছে। সুইজারল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় রেডিয়ামের ব্যবহার, (বিশেষ করে ঘড়ির ডায়ালের পেইণ্ট হিসাবে) নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তখন রেডিয়ামের বিকল্প হিসাবে মেসোথোরিয়াম বা রেডিয়াম 228-এর ব্যবহার করা হয়। পরে এই মেসোথোরিয়ামেরও মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তার জন্য তাকে বাদ দেওয়া হয়।

বর্তমানে তাই ঘড়ির ডায়ালের 'পেইণ্ট' হিসাবে ফসফরাস, এবং ফসফরাসের নানা যৌগকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। নূতন দুটি পেইণ্ট পদার্থের মধ্যে প্রোমেথিয়াম-147 এবং টিট্রিয়ামের কথা উল্লেখ করা যায়। টিট্রিয়াম প্রকৃতপক্ষে সাধারণ হাইড্রোজেনের 2টি নিউট্রনযুক্ত একটি আইসোটোপ। উক্ত দুই মৌলই তেজস্ক্রিয় গামা রশ্মি (γ-rays) নিঃসরণ করে না। প্রধাণতঃ বিটা (β) রশ্মির নির্গমন ঘটে বলেই হাতঘড়ির কাচের আবরণকে এটা ভেদ করে যেতে পারে না।

তবে অসুবিধার মধ্যে এই যে, ঐ দুই মৌলিক পদার্থই অস্থায়ী হয়ে থাকে। টিট্রিয়ামের পেইণ্ট প্রায়ই উঠে যায়, এবং প্রোমেথিয়ামের অর্ধায়ু (Half-life) মাত্র 2·5 বৎসর হওয়ায় একে বেশী দিন ব্যবহার করা যায় না। সেদিক থেকে কিন্তু রেডিয়ামের অর্ধায়ু বেশী বলে ব্যবহারও সুবিধাজনক।

রেডিয়াম ডায়াল দেওয়া ঘড়ি যারা তৈরী করে, তাদের মধ্যে প্রায়ই মারাত্মক হাড়ের ক্যানসার বা টিউমার দেখা যায়। রেডিয়ামের ব্যবহার একদিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। শুধু তাই নয়, এই ধরনের ঘড়ি পরা লোকের জনন অঙ্গে প্রতি বছর প্রায় দশ থেকে পনেরো মিলিয়্যাডস্ পরিমাণ বিকীরণ পড়ে, যার ফল অতি ভয়াবহ হতে পারে। "ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার" থেকে তাই রেডিয়াম দেওয়া ডায়ালের ঘড়ির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘড়িতে অন্য আলোকদায়ী (cuminous) 'পেইণ্ট'-এর কথাও ভাবা হচ্ছে।

কুসুমিকা—কলেজপাড়া, সিউড়ী, বীরভূম।

যন্ত্রমানব

অমিতকুমার দে

আগামীকাল "ডাঃ সুরেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা। বেশীর ভাগ ফুটবল প্রেমীই মনে করছেন এবার উজ্জ্বল সংঘই জিতবে। কেননা উজ্জ্বল সংঘের মত স্ট্রং প্লেয়ার লিট্‌ল্ স্টার্‌স্ ক্লাবের নেই।

এদিকে সন্ধ্যেবেলায় লিট্‌ল্ স্টারস্ ক্লাবঘরে আগামীকালের খেলা নিয়ে একটি আলোচনা চলছে। অধিনায়ক সুশান্ত বলল, "এবার আমাদের নিশ্চয়ই হারতে হবে। বরুণ পা ভেঙ্গে পড়ে আছে। পট্‌লা কি আর বরুণের মত গোল আটকাতে পারবে।"

ম্যানেজার রমেনবাবু বললেন, "তোমাদের কোন চিন্তা নেই। আমরাই এবার জিতে যাবো। তবে যদি তোমরা আমার কথা শোনো।"

সুশান্ত বলল, "বলুন, আমরা নিশ্চয়ই আপনার কথা মত চলবো।"

রমেনবাবু বললেন, "তাহলো শোনো। আমার নির্দেশ খেলার হাফটাইমে তোমরা কেউ একজন খেলা ছেড়ে বসে যাবে, তাঁর বদলে আমি এমন একজনকে মাঠে নামাবো যে তোমাদের অবশ্যই জিতিয়ে দেবে।"

"গুড নিউজ! কে সেই ব্যক্তি?" সুশান্ত প্রশ্ন করল।

"এখন তা বলবো না। নির্দ্দিষ্ট সময়ই দেখতে পাবে। অনেক রাত হলো। চল এবার ওঠা যাক!"

মনে কৌতুহল নিয়ে সবাই তখন বাড়িতে চলে গেল।

পরদিন বিকেল। রেফারি বাঁশি বাজিয়ে খেলা শুরু করলেন। খেলার সাত মিনিট অতিবাহিত হতেই লিটল্-স্টারস্ খেলো এক গোল। তারপর সমানে গোল খেয়েই চলেছে। রেফারি বাঁশি বাজিয়ে হাফটাইম ঘোষণা করলেন। খেলার ফল এখন 7—0।

আবার খেলা শুরু হলো। এবার লিট্‌ল্স্টারস-এর পক্ষে একজন নতুন খেলোয়াড়কে দেখা গেল। চুল লালচে, নাকটি খুবই উঁচু। খেলোয়াড়টি সব গোলই শোধ করল। এখন ফলাফল 7—7।

খেলা শেষ হওয়ার আর মাত্র 7 মিনিট বাকি আছে। হটাৎ সে একটা শট নিলো। গোলরক্ষক শূন্য বল গিয়ে গোলপোষ্টের পেছনের জালে আঁটকিয়ে গেছে। খেলা শেষ।

একজন ফটোগ্রাফার এগিয়ে এলেন নতুন খেলোয়াড়টির ফটো তুলতে। ক্যামেরার রশ্মিটি গিয়ে যেমনি ওর দেহের ওপর পড়ল অমনি প্রচণ্ড শব্দে ওর দেহ চৌচির হয়ে গেল। সবাই দেখতে পেল খেলোয়াড়টির দেহ অনেক যন্ত্র দিয়ে গঠিত। এরপর ম্যানেজার রমেনবাবু বললেন, "এটা মানুষ নয়। একটা যন্ত্রমানব। আমার এক বিজ্ঞানী বন্ধুর তৈরী। ক্যামেরার রশ্মি যন্ত্রগুলোর ওপর পড়ায় ভেতরে প্রবল বিক্রিয়া ঘটে তাই এই বিস্ফোরণ ঘটল।"

গোপালনগর এম, এস, এস উচ্চ বিদ্যালয়, দিনহাটা, কুচবিহার।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

নবম কলিকাতা পুস্তক মেলায় তোমাদের প্রিয় বিজ্ঞান-লেখকদের আরও কয়েকটি সচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সংগে সম্প্রতি প্রকাশিত বইগুলি তো পাবেই, এবং কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরানো মাসিক ও বার্ষিক সংখ্যাগুলিও দেখতে ও কিনতে পারবে।

অজয় হোম	॥	বিচিত্র জীবজন্তু	১৮·০০
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়	॥	বিচিত্র বিজ্ঞান	১০·০০
বিমান বসু	॥	গ্রহ পরিচয়	১০·০০
সিদ্ধার্থ ঘোষ	॥	অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক	৬·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	॥	রোবোট এল কেমন করে?	৬·০০
সমরজিৎ কর	॥	সমুদ্রের সম্পদ	৮·০০
অমরনাথ রায়	॥	নলেজ কুইজ	১০·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	॥	যুক্তি তর্ক হেঁয়ালি	১০·০০
সমরজিৎ কর	॥	নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	১৫·০০
পার্থসারথি চক্রবর্তী	॥	মাটি থেকে আকাশে	১০·০০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	॥	পশু পাখী কীট পতঙ্গ	৮·০০
অমরনাথ রায়	॥	সংখ্যা নিয়ে খেলা	৮·০০
সিদ্ধার্থ ঘোষ	॥	লুইস ক্যারোলের ধাঁধা	১০·০০
অমরনাথ রায়	॥	জ্ঞান-বিজ্ঞানেব মজার খেলা	৫·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	॥	পশুপক্ষী	২০·০০
অমরনাথ রায়	॥	সায়েন্স কুইজ	১০ ০০
অজয় হোম	॥	বাংলার পাখি	২০·০০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	॥	বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার	৬·০০

॥ বই মেলায় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্টলে যোগাযোগ কর ॥

নতুন সংখ্যা পুরোন সংখ্যা ও বিশেষ সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

পত্রপ্রেরকদের কাছে অনুরোধ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে দৈনিক প্রচুর চিঠি আসে।
সে সব চিঠির বিষয়বস্তুও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ বা লেখা পাঠান
কেউ বা অন্য কিছু। আবার লেখাও ত নানা রকমের।
কেউ পাঠান ছোটদের দপ্তরে প্রকাশের জন্যে।
আবার অনেকে লেখা পাঠান সাধারণ বিভাগে প্রকাশের জন্যে।
লেখা ছাড়াও প্রকাশিত বিষয়ের উপরে অনেকে আলোচনা
করে চিঠি পাঠান, যেগুলি 'চিঠি পত্র' বিভাগে প্রকাশিত হয়।
কেউ বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা রকম প্রশ্ন করে পাঠান—
যার উত্তর ছাপা হয় 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে। এই
সমস্ত চিঠি খুলে, পড়ে বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা নিতে অনেক দেরি হয়ে যায়।
তাই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে
আমাদের অনুরোধ তারা যেন চিঠি বা খামের উপরে বিষয়টি
পরিষ্কার ভাবে লিখে দেন। যেমন:
এক : কি ধরনের লেখা ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি।
দুই : সংশ্লিষ্ট বিভাগের উল্লেখ করা বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, প্রশ্নোত্তর,
নিজে কর বা ছোটদের দপ্তর ইত্যাদি।
তিন : সাধারণ চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে 'চিঠিপত্র' এবং কোন নির্দিষ্ট
বিষয়ের চিঠি হলে সেই, বিষয়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
যেমন, 'ঘনাদা ক্লাব' ইত্যাদি।
চার : আমন্ত্রিত রচনা বা প্রতিযোগিতামূলক রচনার ক্ষেত্রে সেই
বিষয়ের উল্লেখ খাম বা চিঠির উপরে থাকা প্রয়োজন।
আশা করি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা
আমাদের সহযোগিতা করবেন।

—সম্পাদক

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 3rd year · March 1984 Regd No WBCC/50

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায়
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮·00

সমরজিৎ কর
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫·00 সমুদ্রের সম্পদ ৮·00

অমরনাথ রায়
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫·00

অরূপরতন ভট্টাচার্য
রোবোট এল কেমন করে ৬·00

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৬·00

অমরনাথ রায়
সায়েন্স ক্যুইজ ১০·00

সিদ্ধার্থ ঘোষ
স্যাম লয়েড ও ল্যুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০·00
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৬·00

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার
কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫·00

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮·00 মেঘনাদ ১০·00

অদ্রীশ বর্দ্ধন
কিশোর সায়েন্স ফিকশ্যান ১৫·00

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮·00

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা–৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রচ্ছদমুদ্রণ রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২